দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

সংবিধানে সংরক্ষিত
মত প্রকাশের স্বাধীনতা
অবাধ নয় — পৃঃ ২৮

সংবিধানে জালিয়াতি ও
কম্যুনাল ভায়োলেন্স
বিল — পৃঃ ১১

৭৪ বর্ষ, ১২ সংখ্যা।। ২৯ নভেম্বর, ২০২১।। ১২ অগ্রহায়ণ- ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

ভারতীয় সংবিধান
কতটা ভারতীয়

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২৯ নভেম্বর - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

কৃষি আইন রদ বেল পাকলে মমতার কী ?
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

এগিয়ে বাংলা, এবার ত্রিপুরা ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

প্রধানমন্ত্রী আপনি সঠিক কাজটিই করেছেন
◻ তভলিন সিংহ ◻ ৮

মুজিবের বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের উপহার বাংলাদেশে হিন্দু কমেছে ৭৫ লক্ষ ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

সংবিধানে জালিয়াতি ও কম্যুনাল ভায়োলেন্স বিল
◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ১১

কায়েমি স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কায় বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৩

ভারতের সংবিধানে হিন্দু বাঙ্গালি নন্দলাল বসুর অবদান
◻ আনন্দ দেবশর্মা ◻ ১৫

রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর লম্ফঝম্প
◻ ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী ◻ ১৭

ভারতের সংবিধান কতটা ভারতীয় ? ◻ নিখিল চিত্রকর ◻ ২৩

ভারতীয় সংবিধান একটি সাজানো বাগান
◻ অনামিকা দে ◻ ২৫

ভারতীয় সংবিধানে ভারতীয় সংস্কৃতি ◻ অমলেশ মিশ্র ◻ ২৭

সংবিধানে সংরক্ষিত মত প্রকাশের স্বাধীনতা অবাধ নয়
◻ বিমলশংকর নন্দ ◻ ২৯

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
◻ কৌশিক রায় ◻ ৩১

তুলসীমঞ্চ ছাড়া হিন্দু বাঙ্গালির গৃহস্থালী অসম্পূর্ণ
◻ চূড়ামণি হাটি ◻ ৩৩

প্রতিপদে নিরুদ্ধ নটি বিনোদিনী ◻ শেখর চক্রবর্তী ◻ ৩৫

ভারতে তালিবান হামলার আশঙ্কা অমূলক
◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ৪৩

দেশের ক্রীড়া ভবিষ্যৎকে শক্তিশালী করতে প্রস্তুত হচ্ছে ভারত
◻ অনুরাগ ঠাকুর ◻ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন ◻ ৩৯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ চিত্রকথা ◻ ৫০

With Best Compliments from :

A
WELL WISHER

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

With Best Compliments from :

A
WELL WISHER

সম্পাদকীয়

ইন্ডিয়া এবং ভারতবর্ষ

সংবিধানকে দেশের শাসনপ্রণালী এবং আইনব্যবস্থার আত্মা বলা যাইতে পারে। শাসকের দেশ শাসনের নীতি কীরূপ হইবে তাহা স্থির করিয়া দেয় সংবিধান। সুতরাং সংবিধান রচনার প্রাথমিক শর্ত ইহাকে দেশীয় সংস্কৃতি এবং লোকাচারের দর্পণ হইয়া উঠিতে হইবে। অন্যথায় ইহা দেশের মানুষের সংবিধান হইয়া উঠিতে পারিবে না।

এই প্রসঙ্গ কেন উঠিল তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান অধিগ্রহণের দিন হইতে একটি প্রশ্ন বারংবার উঠিয়াছে। ভারতের সংবিধান কি ভারতের, নাকি ইন্ডিয়ার? যাহারা এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন তাহাদের মতে, ভারত ও ইন্ডিয়া একই দেশের নাম হইলেও কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিচারে ইহাদের আত্মা এক নহে। ইন্ডিয়া যদি একটি ব্রিটিশ উপনিবেশের নাম হয়, তাহা হইলে ভারত তাহার নিজস্ব অস্মিতা ও অস্তিত্ব সম্পন্ন একটি প্রাচীন দেশ। পরাধীন উপনিবেশের সহিত একটি প্রাচীন রাষ্ট্রের তুলনা করা বাতুলতা মাত্র। অতীব দুঃখের বিষয়, ভারতের সংবিধান রচনার সময় প্রণেতারা এই সহজ কথাটি মনে রাখেন নাই। তাঁহারা সর্বমোট দশটি দেশের সংবিধানের নানাবিধ অংশ আহরণ করিয়া ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইংরেজি ভাষায় প্ল্যাগায়ারিজম বলিয়া একটি শব্দ বিদ্যমান। ইহার অর্থ প্রত্যয়ন বা অনুকরণ। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই এই শব্দার্থের সঙ্গে সম্যক পরিচিত। দেশের সংবিধানে যাহারা দেশকে খুঁজিয়া পান নাই তাহাদের অভিমত, সংবিধান প্রণেতারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সংবিধানের অনুসরণযোগ্য অংশগুলি ভারতের সংবিধানে প্রায় কপিপেস্ট করিয়া বসাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে ভারতের সংবিধান ইহার উত্তরও দিয়াছেন। বাবাসাহেব আম্বেদকর বলিয়াছেন, যে দেশের সংবিধানের যাহা উত্তম তাহা অনুসরণ করিবার মধ্যে কোনও দোষ নাই।

কথাটি নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য। সদ্য স্বাধীন একটি দেশের সংবিধান রচনার প্রাক্কালে প্রণেতাগণ পূর্বসূরিদের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। সুবিধাজনকও বটে। কিন্তু রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের প্রাচীনত্ব এবং তাহার সংস্কৃতির সর্বময়তা এই ভাবনার পরিপন্থী। নির্দ্বিধায় বলা যাইতে পারে ভারত যদি পাকিস্তানের মতো নবীন দেশ হইত তাহা হইলে এই ভাবনায় কোনও গোল বাধিত না। স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠিয়াছে, গণতন্ত্র ন্যায় এবং সাম্যের আদর্শ কি প্রাচীন ভারতের শাসনতন্ত্র অধ্যয়ন করিলে পাওয়া যাইত না? ইহার জন্য ইউরোপে যাওয়ার প্রয়োজন হইল কেন? সুপ্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ ষোড়শ জনপদের দেশ হিসেবে পরিচিত। প্রতিটি জনপদে সম্রাট কে হইবেন তাহা নির্ধারণ করিতেন সাধারণ মানুষ। গণতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইহার চাইতে আর কী হইতে পারে। স্বয়ং অমিতাভ বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোদন ছিলেন এমনই এক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সম্রাট। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের কথাও। তিনি কোনও রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। গুপ্তযুগের অন্তে সারা দেশে যখন নিদারুণ নৈরাজ্য বিরাজ করিতেছে, সৃষ্টি হইয়াছে মাৎস্যন্যায়ের পরিস্থিতি—তখন সাধারণ মানুষ গোপালকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ইহা কি গণতন্ত্র নহে? বস্তুত ভারত 'রাজার বংশধরই রাজা হইবার যোগ্য'—এই আপ্তবাক্যকে বহু আগেই চ্যালেঞ্জ করিয়াছিল। ব্রিটেন যাহা আজও পারে নাই। নন্দবংশের রাজা ধননন্দের অত্যাচারে দেশের মানুষ তখন ভীত, সন্ত্রস্ত এবং পরিবর্তনের আশায় উন্মুখ। সেই সময় চাণক্য প্রশিক্ষণ দিয়া চন্দ্রগুপ্তকে ভাবী সম্রাট রূপে নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইতিহাস বলিতেছে চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরিয়া দেবী ছিলেন রাজপ্রাসাদের দাসী মাত্র। সুতরাং বলা যাইতে পারে গণতন্ত্রের ধারণা ভারতবর্ষের অবিদিত ছিল না। হাত বাড়াইলে ইহার সন্ধান দেশের ইতিহাসেই মিলিত। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। কারণ, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ক্ষমতার হস্তান্তর হইয়াছিল, স্ব-তন্ত্র মেলে নাই। ঔপনিবেশিকতা তখনও দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যমান। উৎকর্ষের সন্ধান করিতে তখন ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত ভিন্ন অন্য কোনও পথ ছিল না। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে। এখনও আমরা ইন্ডিয়া হইতে ভারতে ফিরিতে পারি নাই। আমাদের সংবিধানেও ইন্ডিয়ার ছবিটি সুচারু রূপে ফুটিয়াছে, ভারত মুখ লুকাইয়াছে অন্তরালে।

সুভাষিতম্

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।

যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।।

কেবল শাস্ত্রবাক্য অবলম্বন করে কর্তব্য নির্ণয় করতে নেই; যুক্তিকেও অবলম্বন করতে হয়। কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি হয়।

কৃষি আইন রদ বেল পাকলে মমতার কী?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

আসন্ন সংসদ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কৃষি আইন বাতিলের নিদান দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেজায় খুশি। লড়াকু কৃষকদের টুইট করে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সমর্থনে কবিতা লিখেছেন। তাঁর ধারণা এতে বিজেপি সমস্যায় পড়বে। আগামী বছর পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে প্রধানভাবে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি ধাক্কা খাবে। তৃণমূলের বাড়বাড়ন্ত হবে। তৃণমূলের লক্ষ্য ১০ রাজ্যে পদচিহ্ন তৈরি করা। মোদী বিরোধিতায় মমতা ভারত পরিক্রমা করবেন। প্রচার করবেন গোয়া, বারাণসী, ত্রিপুরা-সহ হিমাচল, পঞ্জাব আর উত্তরপ্রদেশে।

২০১২ সালে উত্তরপ্রদেশের মন্ট বিধানসভা কেন্দ্রে ১টি আসন পায় তৃণমূল। জয়ী প্রার্থী শ্যামসুন্দর শর্মা পরে মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টিতে যোগ দেন। কৃষি আইন রদের ধ্বজা উড়িয়েছেন মমতা। অথচ নিজের রাজ্যে উলটো কাজ করেছেন। ২০১৪ সালে কৃষি বিপণন আইন বা এপিএমসি-রেগুলেশন (১৯৭২) সংশোধন করেন মমতা। যে যুক্তিতে তিনটি কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরোধিতা করা হয়েছে এ রাজ্যে সেই যুক্তির কোনও আমলই দেননি মমতা।

সংশোধনের মাধ্যমে রাজ্যের কৃষি বিপণনে বড়ো কোম্পানির প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। ঠুনকো আর অকিঞ্চিৎ প্রতিবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে দাবিয়ে দেন মমতা। দুর্বল বিরোধী বাম, বিজেপি বা কংগ্রেসের বিরোধিতা হাওয়ায় উড়িয়ে দেন মমতা। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ৩৫৮ দিন লড়ে সাফল্য পান কৃষকরা। এখানকার বিরোধীরা মমতার বিরুদ্ধে তিনদিনও লড়তে পারেননি। ধূলিসাৎ হয়ে যান।

মমতার কেন্দ্র বিরোধিতা অনেকটাই মূল্যহীন। এর বড়ো নিদর্শন সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে তৃণমূলের অবস্থান। লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক বা চিফ হুইপ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কমিটির মাথা। মার্চ মাসে এই কমিটি জানায় যে কৃষি আইন লাগু হলে কৃষকদের আয় বাড়বে। এটা আংশিক সত্য, কারণ আইনকে হুবহু মান্যতা দিতে কমিটি রাজি হয়নি। তবে রদ হতে চলা আইনের যে গুণ রয়েছে তা মেনে নেয় তৃণমূল। তারা অন্ধ বিরোধিতা করেনি।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পঞ্জাবের কৃষক নেতারা মমতার হয়ে মোদীর বিরুদ্ধে প্রচারও করে যান। মমতা তাদের সহজেই বুঝিয়ে দেন তিনি কোনও কৃষক বিরোধী কাজ করেন না। তাঁর কৃষক বন্ধু প্রকল্প কীভাবে রাজ্যের কৃষকদের সাহায্য, তা তুলে ধরেন মমতা। এটা চেপে যান যে এই রাজ্যের কৃষকরা ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পান না। কৃষি উৎপাদন মূল্য সহায়ক মূল্যের দেড়গুণও নয়। মমতা ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রাও কমিয়ে দিয়েছেন।

মমতা চতুর নেত্রী। যখন যেমন তখন তেমন। যেখানে যেমন সেখানে তেমন। এই মুহূর্তে কংগ্রেস মুক্ত ভারত তার লক্ষ্য। তাই কৃষি বিল প্রত্যাহার নিয়ে কংগ্রেস যে অর্থহীন কৃতিত্ব দাবি করেছে তার ফয়দা তুলতে চান মমতা। এই ধরনের মূল্যহীন দাবি কংগ্রেসকে দুর্বল করবে। কৃষকরা ছাড়া এই কৃতিত্ব নিতে যাওয়া বোকামি। উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে কংগ্রেস হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সে সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নন মমতা।

মমতা জানেন ওই রাজ্যে তিনি কোনো দাগ কাটতে পারবেন না। ওখানকার ৪০৩ বিধানসভা আসনের মধ্যে বিজেপি ৩১২ আর কংগ্রেস ০ (শূন্য)। সমাজবাদী দল ৪৭ আর বহুজন সমাজ ১৯ আসন। মমতা ঝাঁপাচ্ছেন কংগ্রেসের ফাঁকা জায়গা নেওয়ার জন্য। বারাণসী থেকে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কমলাপতি ত্রিপাঠির নাতি রাজেশকে তিনি রাজ্যসভায় পাঠাবেন বলে স্থির করেছেন। কংগ্রেস এঁদের সম্মান দেয়নি। মমতা তার ফয়দা তুলছেন। গোয়া থেকে বৃদ্ধ ফেলেরোকে তিনি রাজ্যসভায় পাঠিয়েছেন। অসম থেকে সুস্মিতা দেব। তার আগে আমলা জহর সরকার। রাজ্যের কোনও তৃণমূল নেতার ওপর ভরসা নেই মমতার।

আপাতত রাজ্য বিজেপিতে শুদ্ধিকরণ শুরু হয়েছে। বিজেপির পদহীন সর্বভারতীয় নেতা তথাগত রায় দলকে বিদায় জানিয়েছেন। দলের কিছু নাম গোত্রহীন নেতা তাঁকে উচ্ছিষ্ট বলেছেন। বিজেপির এই কোঁদল উপভোগ করছেন মমতা। এ সপ্তাহে তিনি দিল্লিতে ধরনায় বসছেন। নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। রাজনৈতিকভাবে তাঁর দিল্লি যাত্রা লক্ষ্যণীয়। মমতা জানেন বিজেপি জোট ১৮ রাজ্যে, কংগ্রেস ৬ রাজ্যে আর তৃণমূল কেবল পশ্চিমবঙ্গে। তাই 'বেল পাকলে মমতার কী?' □

রাজনৈতিকভাবে মমতার দিল্লি যাত্রা লক্ষ্যণীয়। নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। মমতা জানেন বিজেপি জোট ১৮ রাজ্যে, কংগ্রেস ৬ রাজ্যে আর তৃণমূল কেবল পশ্চিমবঙ্গে। তাই 'বেল পাকলে মমতার কি?'

এগিয়ে বাংলা, এবার ত্রিপুরা

সুন্দর মৌলিক

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা

বিধানসভা নির্বাচনে দিদির দল যে বিপুল জয় পেয়েছে তার পরে কি আর পিছন ফিরে দেখার কোনও মানে আছে? এবার ত্রিপুরা দখল করতে হবে। ত্রিপুরায় গিয়ে বলতে হবে, চাকরি নেই কেন, শিল্প কম কেন, এত গরিব কেন? আসলে সেদিন টিভিতে দেখছিলাম তৃণমূলের সায়নী অভিনেত্রীকে গ্রেপ্তার নিয়ে দলের নেতাদের কত না হম্বিতম্বি। দলের যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলেইছেন ত্রিপুরায় পুরো নির্বাচনে খাতাই খুলতে পারবে না বিজেপি।

তখন আমি টিভির সামনে বসে ভাবছিলাম, ত্রিপুরার কোনও নাগরিক যদি একটা প্রশ্ন করে বসেন তবে কেমন হয়। পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বাঙ্গলা বানানোর যে দাবি তৃণমূল নেতারা ত্রিপুরায় গিয়ে করছেন তা সত্যি ধরে নিয়ে যদি কেউ প্রশ্ন করেন, এতই যখন সব হয়েছে তবে তোমাদের বাঙ্গলায় এখনও মহিলাদের মাসে মাসে হাত খরচের ৫০০ টাকা দিতে হয় কেন? যদি প্রশ্ন করে কেউ যে, পশ্চিমবঙ্গে যুবকদের যদি কর্মসংস্থান হয়ে গিয়ে থাকে তবে বাবা-মা মারা গেলে সরকারের থেকে হাত পেতে সৎকারের খরচ বাবদ ২০০০ টাকা নিতে হয় কেন? না, কেউ প্রশ্ন করেননি। কিন্তু রাজ্যের মানুষ হয়ে তখন আমার লজ্জা লাগছিল। ভাবছিলাম কেউ যদি সেই প্রশ্নটা করে ফেলে তবে তো মহাবিপদ হবে। সেই প্রশ্নটা মানে ওই পেট্রোল-ডিজেল আর কী!

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় তৃণমূল কত কিছু না বলেছে। তারপরে কেন্দ্র দাম কমিয়ে দিলে বাকি অনেক রাজ্যই সেই পথে হাঁটে। ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরাও সেটা করে দেখিয়েছে। কিন্তু বড়ো দিদি বাংলা! এগিয়ে বাংলা। সে পেট্রোল-ডিজেলের দাম থেকে স্কুলের

চাকরিতে দুর্নীতি সবেতেই এগিয়ে বাঙ্গলা।

কলকাতা শহরে প্রতিদিন কোনও না কোনও শিক্ষক গোষ্ঠী প্রতিবাদ জানাতে পথে নামেন। আসলে প্রাথমিক থেকে উচ্চ স্তরে স্তরে কত যে দুর্নীতি তার ইয়ত্তা নেই। সম্প্রতি একটি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা শুনে আদালত চমকে গিয়েছে। দুর্নীতি এতটাই আকাশছোঁয়া যে আদলত নিজের থেকেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলছেন, 'আমি নই, আমার সময়ের নয়।' আগের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'আমি নই, আমার সময়ে হতে পারে কিন্তু আমি নই।'

দুজনেই সত্য বলেছেন। এই দুর্নীতির সঙ্গে তাঁরা কেউ যুক্ত নন। এই দুর্নীতি দলের। এই দুর্নীতি সরকারের। দিদির। ভাই হয়েও বলছি, দিদির।

দিদির প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী 'আমি নই'। কেউ কি বলেছেন যে আপনি করেছেন। লোকে জানতে চাইছে 'অপকম্মটা' হয়েছে কি হয়নি! সেটা সিবিআই দেখবে। তবে পার্থবাবুর ভুলে যাওয়ার কারণ আছে। আজকের কথা তো নয়। সেই ২০১৬ সাল বিধানসভা নির্বাচনের আগে বেকারদের প্রলুব্ধ করার জন্যে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল রাজ্যের স্কুলগুলোতে ৬ হাজার গ্রুপ ডি শূন্য পদে নিয়োগ হবে। সাত লক্ষের বেশি আবেদন জমা পড়েছিল। তৃণমূল দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে স্কুল সার্ভিস কমিশন পরীক্ষার ব্যবস্থাও করে। ২০১৭ সালের নভেম্বরে প্যানেল প্রকাশিত হয়। সেই অনুযায়ী নিয়োগ হয়। প্যানেলের মেয়াদ ছিল ২০১৯ সালের ৪ মে পর্যন্ত। কিন্তু মেয়াদ ফুরলেও নিয়োগ থামেনি। পার্টির কোটায়, নেতাদের কোটায় নিয়োগ চলতেই থাকে। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে লক্ষ লক্ষ টাকায় চাকরি দেওয়া শুরু হয়। তপসিয়া আর কালীঘাট থেকে তালিকা তৈরি হয় বলে গুঞ্জনও ওঠে। কিন্তু পুরোটাই গুজব বলে উড়িয়ে দেয় শাসক। বিষয়টি ধামা চাপাও পড়ে যায়। এখন কেঁচো খুঁড়তে দলে দলে কেউটে উদ্ধার হয়ে চলেছে। শোনা যাচ্ছে, এমন চার হাজার চাকরি পার্টির কোটায় বিক্রি হয়। কত দামে? শোনা যায় বাজার দর এখন ১৪ থেকে ১৬ লক্ষ। ভাবুন অঙ্কটা। ৪০০০×১৪ লক্ষ।

না, এসব নস্যি। আপাতত নজর থাকুক ত্রিপুরায়। মুখে স্লোগান থাক— 'এগিয়ে বাংলা'। □

অতিথি কলম

তভলিন সিংহ

প্রধানমন্ত্রী আপনি সঠিক কাজটিই করেছেন

প্রধানমন্ত্রী কৃষি বিল প্রত্যাহারের মাধ্যমে আবার প্রমাণ করলেন তাঁর কাজ ও দূরদৃষ্টির জন্য যে মর্যাদা দেওয়া হয় বাস্তবে তিনি তার থেকেও অনেকটা এগিয়ে আছেন। এই সাম্প্রতিকতম দীর্ঘসূত্রিতা, আলোচনা ও সেগুলির বারংবার ব্যর্থতার পর তিনি শুধু উপলব্ধি করলেন না হাতে কলমে করে দেখালেন যে জনতার ইচ্ছা গণতন্ত্রে যে কোনো শক্তিধর রাজনীতিবিদদের থেকেও অনেক বড়ো। শেষমেশ প্রমাণিত হয়েছে যে কৃষি আইনের ভালো মন্দকে ছাপিয়ে উঠেছে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। অধিকার। সেখানে বিজয়ী হয়েছে গণতন্ত্র। মোদীজী পূর্ণ সদিচ্ছা ও কৃষক-কল্যাণে বিল আনলেও গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ তিনি করেননি।

বিগত তিনটি দশক ধরে দেখা ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ও দায়বদ্ধ প্রধানমন্ত্রী গত সপ্তাহে জনতার দরবারে মাথা নত করে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন। কৃষকদের (তথাকথিত) ইচ্ছাকে মেনে নিতে তার ভাবনার সঙ্গে সংঘাত থাকলেও তিনি আইন প্রত্যাহার করে গণতন্ত্রের সাফল্যই প্রমাণ করলেন।

এই প্রসঙ্গে যাঁরা ভাবছেন যে এই তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নরেন্দ্র মোদী দীর্ঘদিন থেকে ঝুলে থাকা কৃষিক্ষেত্রে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলিকে এক লপ্তে উলটো পথে চালিত করবেন তাঁরা ঠিক ভাবছেন না। এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেখানে বড়ো করপোরেটেরা নতুন কৃষি আইনের বলে কৃষকদের জমিজমা সব কেড়ে নেবে এমন আশঙ্কায় তারা মৃত্যুর ঝুঁকি পর্যন্ত নিতে পারে এবং অনেকে লাগাতার প্রতিবাদের ধকল সহ্য করতে না পেরে মারাও যায় সেখানে সংস্কার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। শুধু তাই নয় কৃষি আইনগুলি বাতিল করার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী একথাও বলেছেন যে ভবিষ্যতে এই ধরনের বড়ো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট কিষানদের সঙ্গে কথা বলে নেওয়া হবে। এটি অত্যন্ত শুভ লক্ষণ।

একথা বলতেই হবে যে কৃষিক্ষেত্রে বড়ো ধরনের সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সম্পূর্ণ সৎউদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও সংসদে যে দ্রুততার সঙ্গে এই লক্ষ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত থাকা বিলগুলি অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হয়েছিল তার ফলে কৃষিক্ষেত্রের মানুষজন ও সরকারের মধ্যে একটা পারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই বিশ্বাসহীনতাই আন্দোলনের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। আরও কিছুটা ভুল হয়ে যায় প্রতিবাদী কৃষকদের দিল্লি অভিযানের সময় তাদের নিরস্ত করার পদ্ধতির ক্ষেত্রে। যে সমস্ত কৃষিক্ষেত্রের লোকজন দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলাকালীন রোদ, জল, চূড়ান্ত ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে প্রায় খোলা জায়গায় অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যান— তাদের বিরুদ্ধে সরকারি দলের নানা ব্যক্তির নানা কটূক্তি পরিস্থিতি খারাপ হতে ইন্ধন জোগায়। অন্য নাগরিকদের সমবেদনা তথাকথিত চাষিদের ওপরই গিয়ে পড়তে থাকে। বহু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল এই সুযোগের সদ্ব্যবহারে দেরি করেনি।

প্রধানমন্ত্রীর জনসমক্ষে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে ভুল স্বীকার করা যে 'শতভাগ সৎ উদ্দেশ্য থাকলেও মানুষকে বোঝাতে তাদের খামতি থেকে গেছে'— এটি গণতন্ত্রের পক্ষে এক শুভ লক্ষণ। ভারতের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর এই আচরণ গৌরবের।

এই কটুকথার অযথা দায়ভার কিন্তু অনায়াসেই প্রধানমন্ত্রীর ঘাড়েই চলে এল। তিনিও ব্যক্তিগতভাবে এর ফলশ্রুতিতে একবারও দিল্লি, সীমান্তে বসে থাকা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা না করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সময় তিনি এদের মধ্যে ঢুকে পড়া প্রচারের আলোয় আসার প্রত্যাশীদের উদ্দেশে 'আন্দোলনজীবী' নামে মোক্ষম একটি শব্দবন্ধ প্রয়োগ করছিলেন। এবং এই তকমাটি তিনি সংসদে দেন।

তাঁর এই দাগিয়ে দেওয়ার মূলে ছিল সোশ্যাল মিডিয়া পরিচালনা করা troll করা, একদল মিডিয়া (দলীয়) পেশাদার। এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে 'খালিস্থানী' 'দেশদ্রোহী' ইত্যাদি লোকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে--- এমন প্রচার শুরু হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছয়নি। যেমন একটা ইউরোপীয় পরিবেশ দূষণ বিরোধী আন্দোলনের কিশোরী নেত্রী গ্রেটা থুনবার্গকে খালিস্থানি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বলাটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছুই

নয়। উদ্দাম প্রচারের গ্রহণযোগ্যতা যে বহু সময় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এক্ষেত্রে তা বোঝা গেছে। কারণ আইন বাতিলের আগে পর্যন্ত বহু রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবানের কাছে এই ধরনের তকমা যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যই মনে হয়েছিল। এই ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া-ম্যানিয়াকদের বিশ্লেষণে গা না ভাসিয়ে চাটুকারদের মন্তব্যের ওপর সম্পূর্ণ আস্থাবান না হয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের ও তৎপরবর্তী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার প্রয়োজন যে আছে এই প্রত্যাহার পর্ব তা দেখিয়েছে। সেই অনুযায়ী কাজ করা সরকারের ইচ্ছাধীন। তবে প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয় উপলব্ধি করছেন তাঁর অনুচররা তাঁর সমালোচকদের থেকে তাঁর বেশি ক্ষতি করেছে। তাঁর চাটুকাররা পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণের পরে খবর নিষ্কাশন করে প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে দেওয়ার তুলনায় আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ও ঘৃণা ছড়ানোতেই বেশি ব্যস্ত ছিলেন। এরই ফলে প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছেন এমন একটা ভাবমূর্তি তৈরি হচ্ছিল। হায়! তিনি যে উপযুক্ত সংস্কারের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত আবর্জনা দূর করার চেষ্টা করছেন সেই সত্যটাই প্রেক্ষাপট থেকে সরে যায়।

সেই নিরেট সত্যি কথাটা প্রমাণ করতে তিনি আবার পর্যাপ্তভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে ভারতে নিষ্কম্প পদক্ষেপে যেন উন্নতি ও সমৃদ্ধির সোপানগুলিতে আরও দ্রুতগতিতে উঠতে পারে তিনি তার জন্যই দায়বদ্ধ। কোনো ঘৃণার রাজনীতি তাঁর কাম্য নয়। আজ হিন্দুত্বকে কেন্দ্র করে যে কোনো সম্প্রদায়কে অচ্ছুত করে ঘৃণা ছড়ানো তিনি কখনই অনুমোদন করছেন না। অথচ কিছু লোক বাস্তবে সে কাজেই লিপ্ত আছে। কিন্তু তাঁর এই আন্তরিক ইচ্ছার কথা তার আশপাশে থাকা অনেক ভক্তবৃন্দই উপলব্ধি করতে চাইছেন না। অন্তত সেরকম কোনো লক্ষণ তাঁরা দেখাচ্ছেন না।

এই সূত্রেই কৃষিবিলগুলি প্রত্যাহার করার ঘোষণার সময় অনেকেই লক্ষ্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী এই চালু অ্যাজেন্ডা থেকে সরে আসতে চাইছেন। তিনি এর বদল চাইছেন। এখন যাদের সরকারি দপ্তরগুলিতে যাদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে তাঁরা অনেকেই অর্থনীতি কীসে আরও দ্রুতলয়ে চলে সে বিষয়ে পথ বাতলানোর মনোযোগ দিতে বলা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন উৎস থেকে সাজেশান সংগ্রহ শুরু হয়েছে যাতে অর্থনৈতিক প্রগতিকে আরও বেগবান করা যায়। এই সূত্রে প্রধানমন্ত্রী নাকি বিভিন্ন দপ্তরকে বলেছেন কেন শিল্পপতিদের এখনও এত বহুবিধ ছাড়পত্র বাধ্যতামূলকভাবে জোগাড় করতে হচ্ছে। আর ঠিক এই অনুভূতিটাই বিজেপির সমস্ত সমর্থক ও অনুরাগী যারা প্রধানমন্ত্রীর শুভাকাঙ্ক্ষী তারা যদি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতেন তাহলে প্রধানমন্ত্রীই যে ভারতের মুক্তিদাতা ও যুগপুরুষ সেকথা এখন তাদের তাঁর বিরোধীদের এত কষ্ট করে বারবার বোঝাতে হতো না। তিনি যে গড়পড়তা ভারতবাসীর জীবনের মান উন্নয়ন করতে চান একথা এতদিন পরেও পাখি পড়া পড়তে হতো না। শুধু তাই নয় প্রধানমন্ত্রী চান গণতন্ত্র মানে শুধু সেই পদ্ধতিতে নির্বাচন জেতা নয় তার পরও দেশ পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে জারি রাখা।

এ প্রসঙ্গে গত সপ্তাহে কৃষিবিল প্রত্যাহারে তাঁর ঘোষণার সময় তাঁর অনুরাগীদের বিশেষ করে অন্ধ ভক্তদের কেমন যেন বিভ্রান্ত হতবুদ্ধি বলে মনে হচ্ছিল। কিছু যেন তাদের বলার ছিল না। অন্যদিকে তুলনায় অনেক দুর্বল রাহুল গান্ধীর সোশ্যাল মিডিয়ার লোকজন আনন্দে ফেটে পড়ছিল, তাদের লোকজন বলতে থাকে তাদের গুরুর চাপেই এমনটা করতে বাধ্য হলো সরকার। এর ফলে এটা বোঝা গেল যে তারা আইনগুলি সম্পর্কে আগেও কিছু জানত না এখনও জানে না যেটা তাদের জানা দরকার।

আজ প্রধানমন্ত্রীর মতো এমন একজন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও শক্তিধর প্রধানমন্ত্রীর জনসমক্ষে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে ভুল স্বীকার করা যে শতভাগ সৎ উদ্দেশ্য থাকলেও মানুষকে বোঝাতে তাদের খামতি থেকে গেছে— এটি গণতন্ত্রের পক্ষে এক বিশাল শুভ লক্ষণ। ভারতের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর এই আচরণ গৌরবের। কারও জয়-পরাজয় নয়। কৃষকরা এ-সত্য উপলব্ধি করে মিষ্টি বিতরণ করেছেন। তারা আরও বলেছেন প্রধানমন্ত্রীকে তাদের মধ্যে মিষ্টান্ন উৎসবে পেলে আরও ভালো লাগত। তারা রাজনৈতিক পণ্ডিতদের হার-জিৎ হিসেব করার থেকে নিজেরা ঠিক বুঝেছিল যে এটি ভারত ও তার গণতন্ত্রের অগ্রগতির পথে একটি সোনালী দিন। তাই কৃষিক্ষেত্রে সংস্কারের চেয়েও ভারতীয় গণতন্ত্র আজ কতটা শক্তিশালী ও বেগবান এবং একই সঙ্গে তার সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাবান পরিচালকও কতটা ইতিবাচক শক্তি জোগাতে পারেন তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

(লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও রাজনৈতিক প্রতিবেদক)

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলার ব্যবস্থা প্রমুখ সতীনাথ মণ্ডলের পিতৃদেব গত ১৬ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। তাঁর প্রয়াণ সংবাদে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা শোকাহত। তাঁর অমর আত্মা ৯২ বছর বয়সে পার্থিব শরীর ত্যাগ করেছে। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, পুত্রবধু, ৩ কন্যা ও জামাতা, নাতি ও নাতনিকে রেখে গেছেন।

* * *

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার ক্ষীরপাই নিবাসী বিনয়কৃষ্ণ কুলভী গত ১৬ নভেম্বর মেদিনীপুর শহরে একমাত্র কন্যার বাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। সকলে তাঁকে মন্টুদা বলেই ডাকত। তিনি অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক। দশম শ্রেণীর পরীক্ষা দিতে গিয়ে বিষ্ণুপুরে প্রচারক বিদ্যুৎ দত্তের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে ক্ষীরপাই ফিরে এসে সঙ্ঘের শাখা শুরু করেন। তাঁর দাদা বিজনকৃষ্ণ কুলভী সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তা। তিনি ঘাটাল মহকুমার কার্যবাহ ও পরে সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। স্ত্রী আগেই প্রয়াত। মৃত্যুকালে কন্যা, জামাতা, দুই নাতি, এক দাদা, এক দিদি রেখে গেছেন।

মুজিবের বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের উপহার

বাংলাদেশে হিন্দু কমেছে ৭৫ লক্ষ

বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। কথাটায় নতুনত্ব কিছু নেই, বরং বহু ব্যবহারে কিছুটা ক্লিশে। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিএসবি), আদমশুমারি ও গৃহগণনা, ২০১১-কে উদ্ধৃত করে বাংলাদেশের দৈনিক সংবাদপত্র 'নতুন আলো' যে তথ্য দিয়েছে তা রীতিমতো চমকে ওঠার মতো। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম নেওয়ার পর ১৯৭৪ সালে সেদেশে যে জনগণনা হয়, তাতে মোট জনসংখ্যা সাত কোটি তেষট্টি লক্ষ আটানব্বই হাজারের মধ্যে হিন্দুর জনসংখ্যা ছিল এক কোটি তিন লক্ষ তেরো হাজার। শতাংশের হিসেবে মোট জনসংখ্যার ১৩.৫ শতাংশ। সেইসময় সেদেশে মুসলমান জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৮৫.৪ শতাংশ। ২০১১ সালে বাংলাদেশে শেষতম জনগণনায় সেদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার। এর মধ্যে হিন্দু সাড়ে আট শতাংশের মতো, অর্থাৎ ১ কোটি ২৭ লক্ষের কিছু বেশি। অর্ধশতাব্দী আগের হিসাব অনুযায়ী অর্থাৎ তেরো দশমিক পাঁচ শতাংশ হারে হিন্দুর জনসংখ্যা আজকে থাকলেও তাদের জনসংখ্যা হতো প্রায় ২ কোটি ২ লক্ষ ১৯ হাজার। এই হিসাব থেকে স্পষ্ট বিগত পঞ্চাশ বছরে হিন্দু কমেছে প্রায় ৭৫ লক্ষের মতো। পরিসংখ্যানবিদদের পরিভাষায় এটা হলো 'মিসিং হিন্দু পপুলেশন' বা 'হারিয়ে যাওয়া হিন্দু জনগোষ্ঠী'। এটাই হলো 'সেরা বাঙ্গালি' প্রোপাগান্ডায় প্রচারিত 'বঙ্গবন্ধু'র 'অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র। বাঙ্গালিকে তাঁর প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ উপহার বলতেও বাধা নেই।

স্বাধীনতার সময়ে পূর্ববঙ্গে হিন্দু ছিল প্রায় ২৮ শতাংশের মতো, স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালের জনগণনায় হিন্দুর সংখ্যা কমে নেমে আসে ২২ শতাংশে। হিন্দুর জনসংখ্যা হ্রাসের বড়ো একটি কারণ ছিল নেহরু-জিন্না চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের জনবিনিময় নিয়মমাফিক হয়নি। অর্থাৎ হিন্দুরা ওপার থেকে এপারে এসেছেন। কিন্তু মুসলমানরা এপার থেকে ওপারে যাননি। এর ফলে দুই পারেই হিন্দুরা বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। ওপারে যদি হিন্দুদের বিপদের কারণ হয়, মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা তবে এপারে অবশ্যই সেকুলারিজম।

এদেশে সেকুলারিজমের অশেষ কৃতিত্ব বাংলাদেশ কত উদার সাম্প্রদায়িক এবং ভারতে কীভাবে সাম্প্রদায়িকতার চাষ হয়, বিশেষ করে বিজেপি ক্ষমতায় এলে, সে অটলবিহারী বাজপেয়ী হোক কিংবা নরেন্দ্র মোদীই হোক, তা বোঝাতে এপারের সেকুলারবাদীরা চেষ্টার ত্রুটি রাখেন না। আর এর মাধ্যমে তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে একটি মারাত্মক সত্যকে গোপন করতে চাইছেন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের মুসলমানদের ক্রীতদাস বানিয়ে রাখতে, হিন্দু রমণীদের মুসলমানদের দেবদাসী বানিয়ে রাখতে মুসলিম লিগের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না, ১৯৪৭-এর আগে থেকেই। 'নোয়াখালি দাঙ্গা', 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর হিন্দুনিধন ছিল তাদের সেই পরিকল্পনারই অঙ্গ। বিশেষ করে, এপারের সেকুলারদের উপাস্য শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ১৯৪৬-এর দাঙ্গার পার্শ্বনায়ক, মূল কুচক্রী শেখ সোহরাওয়ার্দির শাগরেদ। এই চরম সাম্প্রদায়িক, হিন্দু বিদ্বেষী মানুষটি 'সেরা বাঙ্গালি', অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক হয়ে উঠলেন '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে। মুজিবুরের 'আমারে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না'র ভাবে মশগুল হয়ে যারা আছেন, তাদের জন্যে একটা ছোট্ট তথ্য, দেশ-পরিচালনায় বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি আমদানি হলেও তা যে কখনোই গুরুত্ব পায়নি, সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় তৎকালীন পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারের লাগু হওয়া 'শত্রু সম্পত্তি আইন' '৭১-এ পাকিস্তান ভেঙে পূর্ব পাকিস্তান, 'বাংলাদেশ' নামক তথাকথিত 'অসাম্প্রদায়িক' দেশে পরিণত হওয়ার পরও এই আইনটি পূর্ণমাত্রায় বলবৎ থাকে, আইনের নামটি ঈষৎ পরিবর্তন করে 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' নামে। এই আইনে হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছিল। আইনানুযায়ী, ওদেশের সমস্ত সম্পত্তি মুসলমানদের। তাই যখন তখন হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে, মা-বোনেদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে সবকিছু দখল করে নেওয়াকে আইনি বৈধতা দেওয়া হয়েছিল। হিন্দুদের ভিটেমাটি চাঁটি করে সেদেশের থেকে উৎখাত করতে এই আইনটি ভূমিকা কম নয়। এবং এখনও মুজিব কন্যা 'সেকুলার বাংলাদেশে'র ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর শেখ হাসিনার আমলেও এই আইন পূর্ণমাত্রায় কার্যকর, সামান্য সংশোধনী-সহ। যে মুজিবুর রহমান একদা পাকিস্তানের দাবিতে হিন্দু-নিধনে মদত দিয়েছিলেন, সেই পাকিস্তানকে 'ভঙ্গ' করার অপরাধে মুজিবের 'পরিকল্পিত হত্যা'র পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটা বাদ পড়া কিংবা ১৯৮৮ সালে ইসলামকে সেদেশের 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ মৌলবাদী দেশে পরিণত হওয়া মোটেও রাজনৈতিক নয়। বরং এর বিষবৃক্ষ পুঁতেছিলেন মুজিবুর রহমানই— 'শত্রু সম্পত্তি আইন'কে কার্যকর রেখে। বাংলাদেশ তাই জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানের মতো একটি অস্বাভাবিক ও সাম্প্রদায়িক দেশ। এবং নিঃসন্দেহে বলাই যায়, সেকুলারবাদীদের জন্য বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরে এটাই মুজিবুরের শ্রেষ্ঠ উপহার। □

সংবিধানে জালিয়াতি ও কম্যুনাল ভায়োলেন্স বিল

সুন্ধমনিয়াম স্বামী প্রথম এই বিলের প্রতিবাদ শুরু করেন ১৯১২ সালে। ভয়ংকর এই বিলের সর্বনাশা দিক সম্পর্কে জানা ছিল না দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের, যখন জানল কেঁপে উঠেছিল হিন্দুরা।

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

পলিটিক্যালি কারেক্ট হতে চায় সব শিক্ষিত হিন্দু মানুষ। ৭০০ সাল ধরে পরাধীন হিন্দু, ৭০ বছর ধরে ভ্রান্ত ইতিহাস পড়া হিন্দু— কারো সঙ্গে লড়তে চায় না, কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চায় না। ৫০০০ সালের (আসলে আরো বেশি) পুরনো ইতিহাস যাদের তারা কেন কাপুরুষ? একটি হিন্দুবিদ্বেষী দেশী পত্রিকার সাম্প্রতিকতম সংখ্যায় বর্তমান প্রজন্মের খ্যাতনাম্নী এক লেখিকা লিখছেন (আসলে ওই পত্রিকা বাধ্য হয়েছে এমন লেখা ছাপাতে), 'সেই হিন্দুদের যাঁরা ভারতীয়, যাঁরা সেকুলার, যাঁরা অত্যন্ত প্রগতিশীল, ধর্মীয় পার্থক্যকে জীবনে কোনো স্থান দেন না, যাঁরা অহিন্দুদের ওপর রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের নিন্দা করতে পিছপা হন না, কিন্তু শুধুমাত্র হিন্দুদের ওপর অহিন্দুদের অত্যাচারের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দেওয়ার ব্যাপারে বিরত থাকেন, লুকিয়ে পড়েন বা ঘুমিয়ে পড়েন... নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয়টার প্রতি এঁদের অতিরিক্ত মোহের কারণেই, এঁরা যা যা নিন্দনীয় তাকেই নিন্দা করার অপ্রাকৃত চাপ সহ্য করতে পারেন না। ইসলামের অনিয়ন্ত্রিত আগ্রাসনকে এঁরা কখনো সমালোচনা করেন না। সারা পৃথিবী জুড়ে ইসলামের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এঁরা কখনই মুখ ফুটে কোনো বিবৃতি দেন না। কারণ পাছে তাতে তাঁদের ওপর ইসলামোফোবিয়ার ছাপ পড়ে যায়, পাছে এই সমাজের সামনে যথেষ্ট প্রগতিশীল নন, যথেষ্ট সেকুলার নন এই মর্মে তাঁদের দাগিয়ে দেওয়া হয়? এই কারণেই তাঁরা যেখানে যতটুকু বলা দরকার তা বলতে ভয় পান'।

এই বিলে একটি প্রস্তাব ছিল, যদি দাঙ্গাগ্রস্ত এলাকাতে কোনো হিন্দু মহিলা বা বাচ্চাকে ধর্ষণ করা হয় তাহলে সেটাকে ধর্ষণ বলে গণ্য করা হবে না। শুধু তাই নয় কোনো হিন্দু নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলে তার বিরুদ্ধে আলাদাভাবে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণার অভিযোগে মামলা করা হবে।

ওয়াশিংটন পোস্টের সম্পাদক ২০১৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বাচনের পরে মন্তব্য করেছিল স্বাধীনতার ৭০ বছর পরে এই প্রথম ভারত তার নিজস্ব সরকার পেয়েছে। এটা কোনো ভারতীয়ের লেখা নয় বা ভারতের কোনও প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক কারো লেখা নয়। আমাদের যে ইতিহাস পড়ানো হয় তা সব ভুল। ভারতের সংবিধানে শতাধিক সংশোধন হয়েছে কিন্তু সংবিধানে যে বড়ো জালিয়াতি করা হয়েছে তা কাউকে বুঝতে দেওয়া হয়নি। ১৪ মে, ১৯৫৪ জালিয়াতি করেছিলেন জওহরলাল নেহরু। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন এটা অবৈধ, সংবিধান বহির্ভূত, করা যায় না। নেহরু ধমকের সুরে বললেন আপনি এখনই এটাকে লাগু করুন। তারপর নেহরু অনেকদিন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এর মধ্যে ১৯৬১ সালে রাজেন্দ্রপ্রসাদ মারা গেলেন। ধারা চালু হলো কিন্তু কেউ জানল না সেটা কী। সেই ধারাই আর্টিক্যাল-৩৫এ। রাষ্ট্রপতির আদেশে সংবিধানের ধারা বনে গেল! ১৯ আগস্ট ২০১৪ সালে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা হয়েছিল; সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের প্রায় অধিকাংশের এই বিষয়ে কোনো ধারণা ছিল না।

দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সবচেয়ে বিপজ্জনক এই ৩৫এ যা সংবিধানে থাকার কথাই নয়। কাশ্মীর ভারতের মাথা সেখানে যদি ক্যান্সার হয় তবে গোটা দেশ বিপদের মুখে পড়ে। আর্টিক্যাল ৩৫এ অনুসারে কাশ্মীরে থাকতে হলে ভারতের নাগরিককে জম্মু-কাশ্মীরের নাগরিক হতে হবে আলাদা করে। স্বভাবতই সেই নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না এবং তার অর্থ ভারতের নাগরিক ভারতের এক রাজ্য কাশ্মীরে নাগরিক সুবিধা পাবে না। কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর এটাই মূল কারণ। ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই ভারত-সহ গোটা দুনিয়াকে গজওয়া- এ-হিন্দ মানে ইসলামিক রাষ্ট্র বানানো আর তার জন্য এই ৩৫এ— যেটা সম্ভব করেছিলেন মহাপণ্ডিত দূরদর্শী নেহরু। ৫৭ সালে কাশ্মীরের জন্য আলাদা সংবিধান মূল ভারতীয় সংবিধানের অংশ হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়। কাশ্মীরপন্থী নেতারা বললেন কাশ্মীরের সংবিধান ১৯৫৭ সালে হলেও তাকে প্রয়োগ করতে হবে

১৯৪৪ সাল থেকে, ভারত যখন পরাধীন ছিল তখন থেকে। ভিশনারি, দূরদর্শী নেহরু তাতেও সায় দিলেন। তাঁর মনে কী ছিল তা বুঝে নিতে হবে এখান থেকে।

১৯৪৪ থেকে কেন? পাকিস্তানের প্রস্তাব ১৯৪৪ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে পাশ হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৪-এর আগে মুসলমানরা এসে গিয়েছিল। ১৯৪৪ সালে প্রস্তাবিত হয় পাকিস্তান। তখন থেকে মাত্র ৫৫০০ হিন্দু পরিবার পাকিস্তান থেকে কাশ্মীরে এসেছিল কারণ পাকিস্তানে তাদের খুন করা হচ্ছিল। ৪৭-৫৪ পর্যন্ত যত মুসলমান কাশ্মীরে বসবাস করতে শুরু করেছিল তারা বলল আমরা ঠিক করব কাদের নাগরিক করব না করব। ৪৪-এর পরে ৫৫০০ পরিবার এসেছিল— হিন্দু পরিবার, তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। মহান নেতা নেহরু এই পুরো হিন্দু-বিরোধী আইন পাশ করলেন।

মেহবুবা মুফতি সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সামনে শপথ নিয়ে বলেছিলেন, 'যেদিন এই ৩৫এ উঠে যাবে সেদিন ভারতের তেরঙা পতাকা তোলবার কোনো লোক থাকবে না'। অন্য যে কোনো সভ্য দেশ হলে তাকে দেশদ্রোহের অপরাধে তখনই জেলে ভরা হতো। কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো গণতন্ত্রে তা হলো না। ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো ধাঁধাগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম।

১৯৯২-এ গঠিত হলো ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটিজ। এর কোনো সাংবিধানিক বৈধতা নেই। তেমনই অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সনাল 'ল বোর্ড আর ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল।

কমিউনাল ভায়োলেন্স বিল যা কংগ্রেস দু'বার সংসদে পেশ করেছিল ২০০৫-এ এবং ২০১১-তে। আজও এটি পেন্ডিং আছে। কংগ্রেস যদি আবার কখনো সরকার গড়ে তবে আবার এ বিল সংসদে পেশ হবে। এ বিল সম্পর্কে অনেকেই জানে না। ২০১১-তে সোনিয়া গান্ধীর বিশেষ টিম এই বিল তৈরি করেছিল। টিমে ১ ডজনেরও বেশি সদস্য ছিল এবং সেই সদস্যরা হচ্ছে তারা— যাদের আজকাল আরবান নকশাল বলা হয়। এদের একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে তারা সোনিয়া অ্যান্টনি মাইনো গান্ধীর আস্থাভাজন। কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল এই বিলের মাধ্যমে দেশে দাঙ্গা রোধ করা যাবে...ইত্যাদি।

আসুন এবার এই বিল সম্পর্কে কিছু জানি।

যদি কোনো সংখ্যালঘু শুধু অভিযোগ করে যে আমার সঙ্গে বৈষম্য হচ্ছে তাহলে পুলিশের আপনার কথা না শুনে আপনাকে জেলে রাখার অধিকার থাকবে এবং এই ক্ষেত্রে বিচারকও সংখ্যালঘু হবে।

আপনার বাড়িতে যদি কোনো খালি ঘর থাকে আর কোনো সংখ্যালঘু যদি আপনার কাছে ভাড়া চাইতে আসে তাহলে আপনি তাকে ঘর ভাড়া দিতে অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনার মা, বোন বা কন্যার উপর উৎপাত করলেও না। সে শুধু লিখবে মুসলমান বলে তার ওপর অত্যাচার হচ্ছে। অর্থাৎ তারা বাড়ির হিন্দু মহিলাদের নিপীড়ন করলেও আপনি তাকে তাড়াতে পারবেন না। আপনি গ্রেপ্তার হবেন। আপনার কথা শুনবেও না আর বিচারপতি সবসময়ে সংখ্যালঘু হবেন।

দেশের যে কোনো অংশে দাঙ্গা হলে (সেটা সংখ্যালঘু-বহুল এলাকা হলেও) দাঙ্গা যে দলই শুরু করুক না কেন দাঙ্গার জন্য সেই এলাকার বয়স্ক হিন্দু পুরুষদেরই দোষী মানা হবে। আর এখানেও বিচারক সংখ্যালঘুই হবে।

যদি দাঙ্গাগ্রস্ত এলাকাতে কোনো হিন্দু মহিলা বা বাচ্চাকে ধর্ষণ করা হয় তাহলে সেটাকে ধর্ষণ বলে গণ্য করা হবে না। শুধু তাই নয় কোনো হিন্দু নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলে তার বিরুদ্ধে আলাদাভাবে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণার অভিযোগে মামলা করা হবে।

এই বিলে আরেকটি প্রস্তাব ছিল যদি কোনো কারণে পুলিশ আপনাকে ধরে নিয়ে যায় তবে পুলিশের কাছ থেকে আপনি অভিযোগকারীর নাম জানতে পারবেন না। আপনার অপরাধ কী তাও পুলিশ বলবে না।

এই বিলে আরেকটি বিধান ছিল যে কোনো এলাকায় পুজো-আর্চা করার আগে সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে এনওসি নিতে হবে যে তাদের কোনো আপত্তি নেই। মানে জিজিয়া কর দিতে হবে।

এই রকম আরও অনেক বিধান আছে এই বিলে।

কোনো হিন্দু বিচারপতি কোনো সংখ্যালঘুর রেজিস্টার করা মামলা বিচার করবে না।

হিন্দুরা সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে কোনো দাঙ্গার মামলা বা অভিযোগ করতে পারবে না।

যদি কোনো মুসলমান হিন্দুর বিরুদ্ধে সহিংসতা, লুটপাট, অন্তর্ঘাত, খুন এসবের অভিযোগ করে তাকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে হবে না। মামলা ঠুকে দিলেই হবে। অন্যদিকে অভিযুক্ত হিন্দুকে আদালতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে।

সংখ্যালঘুর সম্পদহানির ক্ষতিপূরণ দেবে হিন্দু কিন্তু সংখ্যাগুরুর কোনো সম্পদহানি হলে তার ক্ষতিপূরণ দেবে না সংখ্যালঘু।

কী বুঝছেন? সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী প্রথম এই বিলের প্রতিবাদ শুরু করেন। যখন তিনি এই বিল সম্পর্কে মানুষকে জাগ্রত করা শুরু করেন তখন ২০১২ সালে হিন্দুরা কেঁপে উঠেছিল। ৯৫ শতাংশ হিন্দু এই বিলের সর্বনাশা দিক সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। কারণ তারা ব্যস্ত সম্পদ সংগ্রহে, তাদের সময় কোথায়? এর পরেও যদি কেউ বিশেষত হিন্দু কংগ্রেসকে ভোট দেয় তার মানে নরকের দরজা খুলে দেওয়া হবে হিন্দুদের জন্য। সাবধান! এই বিল কিন্তু এখনো পুরোপুরি মরে যায়নি। কংগ্রেস যদি কোনওভাবে ক্ষমতায় ফেরে তাহলে এই বিল আইনে পরিণত হবে। তখন হিন্দুদের ফেরার আর কোনও জায়গা থাকবে না। ▯

With best compliments from :

A

Well Wisher

কায়েমি স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কায় বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ

সম্প্রতি কেন্দ্রের নতুন নির্দেশিকা মতে অসম, পঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের কাজের এক্তিয়ার ১৫ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত করা হয়েছে। সেই এক্তিয়ার নিয়ে রাজ্যের শাসক দলের পাশাপাশি বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসও তার বিরোধিতা করেছে। সেই সুবাদে গত ১৬ নভেম্বর বিধানসভায় আলোচনা শেষে কেন্দ্র সরকারের নির্দেশিকার বিরুদ্ধে পাশ হলো বিএসএফ প্রস্তাব। পক্ষে ১১২টি এবং বিপক্ষে ৬৩টি ভোট পড়েছে।

মণীন্দ্রনাথ সাহা

কিন্তু সেই অধিবেশনে অশালীন শব্দবন্ধ ব্যবহারের ফলে উত্তাল হয়ে ওঠে বিধানসভার অধিবেশন। তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ বলেন, 'যদি কোনও শিশু ছোটোবেলায় দেখে যে নিরাপত্তার নামে সেনাবাহিনী তার মাকে হেনস্থা করছে, গোপনাঙ্গে হাত দিচ্ছে। তাহলে সে কখনও প্রকৃত দেশপ্রেমিক হতে পারে না।' উদয়ন গুহ'র মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন নাটাবাড়ির বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামী। তিনি চিৎকার করতে থাকেন। তাতে আরও মেজাজ হারান উদয়ন গুহ। তিনি বলেন— 'আপনার এক পা ভাঙা, আরেকটা পা-ও ভেঙে দেব।' তাতে তুমুল শোরগোল শুরু হয় বিধানসভায়।

এরপর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন— 'শাসকদলের বিধায়ক অশালীন ভাষা প্রয়োগ করছেন, হুমকি দিচ্ছেন। এটি এখনই কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হোক। নচেৎ ভবিষ্যতে খারাপ উদাহরণ হিসেবেই থেকে যাবে।'

উদয়নের আচরণে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুব্ধ হলেও তখনই তা কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হয়নি।

উদয়নের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বুধবার বিএসএফ-এর এ.ডি.জি. ওয়াই.বি. খুরানিয়া তাঁর প্রতিক্রিয়ায় উদয়ন গুহর অভিযোগ সরাসরি খারিজ করে দেন। তিনি বলেছেন—

‘সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর দিকে ওঠা এই অভিযোগ দুর্ভাগ্যজনক। আমাদের কাছে চার হাজারেরও বেশি মহিলা জওয়ান রয়েছে। এমন কোনও অভিযোগ এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে আসেনি। আমাদের কাজ সীমান্তে অনুপ্রবেশ রোখা। আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তল্লাশি, গ্রেপ্তার, বাজেয়াপ্ত আমরা করতে পারি কিন্তু আমরা কোনও তদন্তকারী দল নই। আমাদের কাছে তদন্ত করার কোনও ক্ষমতা নেই। আর এই কারণেই সীমান্ত থেকে কাউকে গ্রেপ্তার করা হলে তাকে রাজ্য প্রশাসনের হাতে তুলে দিই।’

বিএসএফ-এর ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে গত সোমবার কলকাতার প্রেসক্লাবে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অভিনেত্রী তথা পরিচালক অপর্ণা সেন। সেইসঙ্গে রাজ্যের তথাকথিত বিদ্বজনেরাও কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু জানা যাচ্ছে ভারতের বেশির ভাগ মানুষ বলছেন যে সীমান্ত এলাকায় ক্রমাগত চোরাচালান এবং জঙ্গি কার্যকলাপ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে বিএসএফ-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি একান্তই জরুরি। অথচ ক্রমাগত কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় রত বঙ্গীয় বিদ্বজনেরা।

শুধু এক্ষেত্রেই নয়, দেশের সুরক্ষার স্বার্থে বর্তমান কেন্দ্র সরকারের যে কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এ রাজ্যের বর্তমান সরকারি দল এবং রাজ্যের বিদ্বজনেরা কেন্দ্রের বিরোধিতা করে চলেছেন। যেমন শাসক দলের নেত্রীই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে প্রমাণ চেয়েছিলেন।

অপর্ণা সেন বলেছেন— ‘মিলিটারিদের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে। ছিটমহলের বাসিন্দাদের কথা ভেবে আমরা আতঙ্কিত হচ্ছি। এমনিতেই তাদের দুর্বিষহ অবস্থা। এবার যদি বিএসএফ-এর ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে তারা আরও সংকটজনক পরিস্থিতিতে পড়লেন। সরকারকে অবশ্যই দেখতে হবে সীমান্তবর্তী মানুষজন যাতে চাষাবাদ করে এবং অন্যান্য সৎপথে নির্বিঘ্নে উপার্জন করতে পারে।’

তৃণমূলের বিধায়ক উদয়নগুহ, বুদ্ধিজীবী বলে খ্যাত অপর্ণা সেন এবং আরও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা সীমান্তে বিএসএফ-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে যেভাবে সোচ্চার হয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের উদ্দেশে কয়েকটি বিনীত প্রশ্ন করতে চাই। জানি তাঁদের কাছে আমার এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই। তবুও প্রশ্ন করছি।

১। কেন্দ্র সরকার বিএসএফ-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে চোরাচালান, গোরুপাচার, অনুপ্রবেশ ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য। তাতে আপনাদের এত গাত্রদাহ কেন? আপনারা কি ওই সমস্ত চোরাকরবারি, অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মাসোহারা পান?

২। সীমান্তের বাসিন্দাদের কথা ভেবে আপনারা আতঙ্কিত। কিন্তু বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় সমগ্র বিশ্বে যখন তার প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছিল তখন কি আপনারা সেই হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন? এই বাঙ্গলার অত্যাচারিত হিন্দুদের কথা ভেবে কি আপনারা আতঙ্কিত হয়েছিলেন?

৩। গোপনাঙ্গে বিএসএফ-এর হাত দেওয়া অভিযোগ প্রসঙ্গে বলতে হয় এটি আপনার (উদয়ন গুহের) মনগড়া কথা। কারণ, আপনি নির্দিষ্ট স্থান, কাল এবং পাত্রের নামের উল্লেখ করেননি। ভোটের পরে রাজ্য সরকার পালিত সন্ত্রাসীরা যখন নির্বিচারে হিন্দুদের ধনসম্পদ লুটপাট, বাড়ি ভাঙচুর, অগ্নি সংযোগ, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি অবলীলায় করেছিল এবং বিরোধী দলের হিন্দুরা গৃহছাড়া হয়ে অন্য রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তখন নিশ্চয় আপনারা আনন্দ উপভোগ করছিলেন? নচেৎ সেই ঘটনার প্রতিবাদ করেননি কেন? করেননি কারণ আক্রান্তরা ছিল হিন্দু আর আক্রমণকারীরা ছিল দুধেল গোরু নামক আপাদেরই ঘনিষ্ঠজনেরা।

৪। সবাই জানে সীমান্ত এলাকায় দুধেল গোরুদের বসবাস অত্যন্ত বেশি এবং তারা প্রতিনিয়ত অসৎপথ অবলম্বন করে থাকে শাসকদেলর নেতাদের পূর্ণ মদতে। তাতে দু’পক্ষেরই প্রচুর লাভ হয়। সেই লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়েই কি এত উতলা শাসক দলের নেতা-নেত্রীরা?

৫। এর আগে কলকাতাকে মিনি পাকিস্তান বলা--- মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন--- ‘বিএসএফ তো চোর। আপনাদের মানসিকতাও যে ফিরহাদের সঙ্গে মিলবে তা তো জানা কথা। অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে আপনারা কি পশ্চিমবঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করে ইসলামি দেশ তৈরি করতে চান?

পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামি রাষ্ট্র বানানোর পরিকল্পনা সামনে রেখে এখানে ঘটছে মূর্তি ভাঙার ঘটনা। রাসমেলার পুজোর জোরদার প্রস্তুতি চলার মধ্যেই উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের শাড়াপুল পলতা এলাকায় মূর্তি ভাঙচুর করেছে একদল দুষ্কৃতী। স্থানীয়দের অভিযোগ--- ‘স্থানীয় একদল মুসলমান দুষ্কৃতী পুজো বন্ধের জন্য চাপ ও হুমকি দিচ্ছিল। রাতের অন্ধকারে মূর্তি ভাঙচুরের মতো জঘন্য ঘটনা ওরাই ঘটিয়েছে’।

যে রাজ্যের সরকার জনগণের করের টাকায় বিদেশি সন্ত্রাসী প্রতিপালন করে শুধুমাত্র ভোটে জিতে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য, সেই রাজ্যের শান্তিপ্রিয় জনগোষ্ঠীর শান্তিতে বসবাসের জন্য এবং চোরাকারবারিদের উপদ্রব বন্ধ করার জন্য শুধু ৫০ কিলোমিটার নয় সীমান্ত এলাকায় প্রয়োজনে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিএসএফ-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার। কেউ যদি মনে করে রাজ্যটা জঙ্গিদের হাতে তুলে দেব তাহলে তারা ভুল করবে। কাকেরা যতই কা কা কা করুক না কেন দেশের সুরক্ষার প্রশ্নে কোনোরকম আপোশ নয়। কেন্দ্র সরকার সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। ◻

With best compliments from :

A
Well Wisher

ভারতের সংবিধানে হিন্দু বাঙ্গালি নন্দলাল বসুর অবদান

আনন্দ দেবশর্মা

স্বাধীনতার ৭৫-তম বর্ষ চলছে। এই উপলক্ষ্যে সমগ্র দেশব্যাপী 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' পালন করা হচ্ছে। তাই স্মরণ করা যাক ভারতীয় সংবিধানে হিন্দু বাঙালি নন্দলাল বসুর অবদান নিয়ে। একটি সার্বভৌম গণতন্ত্র গঠন করতে আমাদের এই মহান দেশের ইতিহাসে ভারতীয় সংবিধানের ভূমিকা অনন্য। এটির প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধকরণে বেশ কয়েক বছর লেগেছে। ভারতের সংবিধান বিশ্বের সর্বাধিক সুসংবদ্ধ ও দীর্ঘতম লেখাসমূহের মধ্যে একটি। ভারতের সর্বোচ্চ ও মৌলিক আইন এতেই বিধৃত হয়েছে। সংবিধানেই রয়েছে রাষ্ট্র প্রশাসনের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ভারতের শাসনপ্রণালীর দু'টি রূপ আমরা পাই। একদিকে ব্রিটিশ সরকার এবং অন্যদিকে বিভিন্ন করদ রাজ্য। সংবিধানে এই বিভাজনের অবসান ঘটিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের।

সংবিধানের কাঠামো নির্মাণে বাঙ্গালিরাও পিছিয়ে ছিল না। ভারতীয় সংবিধানের মূল পাণ্ডুলিপির প্রধান অলংকরণ ও একজন হিন্দু বাঙালির করা। তিনি হলেন নন্দলাল বসু। ১৮৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিহারের মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে তাঁর জন্ম। অবশ্য তাদের আদিবাস পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার হরিপাল-তারেকশ্বরের জেজুর গ্রামে। নন্দলাল বসুর বাবা পূর্ণচন্দ্র বসু ছিলেন দ্বারভাঙ্গা এস্টেটের কর্মচারী। মা ক্ষেত্রমণি দেবী গৃহবধূ হলেও ছিলেন এক বিশেষ প্রতিভার অধিকারী। ছোট্ট নন্দলালের জন্য খেলনা মূর্তি তৈরি করতেন তিনি, কখনো আবার পুরানো খেলনাকে নবকলেবর দান করতেন। স্থাপত্য শিল্পের প্রতি আগ্রহ হয়তো নন্দলাল নিজের মায়ের কাছ থেকেই আহরণ করেছিলেন। তাঁর পিসিতুতো ভাই অতুল মিত্র ছিলেন আর্ট কলেজের ছাত্র। তার পরামর্শেই নিজের আঁকা ছবি নিয়ে নন্দলাল আর্ট কলেজে অবনীন্দ্রনাথ ও হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন ও আর্ট স্কুলে ছাত্র হিসাবে গৃহীত হন। নন্দলাল বসু সংবিধান অলংকরণের আগেও বিভিন্ন কাজে দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। ১৯০৬-১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তার আঁকা বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে সিদ্ধিদাতা গণেশ, শোকার্ত সিদ্ধার্থ, সতী, শিবসতী, জগাই-মাধাই, কর্ণ,

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে নন্দলাল বসু।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নন্দলাল বসু।

গরুড়স্তম্ভতলে শ্রীচৈতন্য, নটরাজের তাণ্ডব, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, জতুগৃহদাহ, অহল্যার শাপমুক্তি, পার্থসারথি, শিব মুখমণ্ডল, শিবের বিষপান, যম ও নচিকেতা, মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠির, উমার ব্যথা, উমার তপস্যা, প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি। পৌরাণিক বিষয়কে ভিত্তি করে আঁকা তার এই ছবিগুলিতে রূপনির্মাণের বিশেষ ভঙ্গী ধরা পড়েছে।

১৯১১-য় আর্ট স্কুলের পাঠ শেষ করে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে জোড়াসাঁকোয় শিল্পচর্চা নন্দলাল বসুর এক অনন্য অভিজ্ঞতা। ভগিনী নিবেদিতার বইয়ের চিত্রসজ্জা রচনা করা ছাড়াও তিনি রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথেরও বহু বইয়ের অলংকরণ করেন। লেডি হেরিংহ্যামের সহকারী হিসেবে তিনি অজন্তা গুহাচিত্রের নকল করার কাজ করেন (১৯০৯)। তাঁর স্মরণীয় কীর্তির মধ্যে রয়েছে গোয়ালিয়রের বাগ গুহার ভিত্তিচিত্রের প্রতিলিপিগ্রহণ, জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে বসু বিজ্ঞানমন্দির অলংকরণ, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রা ক্লাবে শিল্প শিক্ষকতা।

১৯৩৫-৩৭ সালে লাগাতার তিন বছর তিনি কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে শিল্প প্রদর্শনী ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব লাভ করেন। গান্ধীজী ১৯৩৬-এর লখনৌ কংগ্রেস অধিবেশনের প্রদর্শনী ও মণ্ডপসজ্জার জন্য নন্দলালকে ডেকে পাঠালেন। সম্ভবত সেখান থেকেই দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার অধ্যায় শুরু। আর নন্দলালের ওপর গান্ধীজীর নির্ভরতা এই পর্ব থেকেই আরম্ভ হয়েছে। সারা দেশের নানা প্রান্ত থেকে শিল্পকলা সংগ্রহ করে প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন নন্দলাল। তাকে সহযোগিতা করতে সঙ্গে গেলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, বিনায়ক মাসোজী ও যামিনী রায়। এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণ কৃপালনী ও গণেন মহারাজ। প্রদর্শনীর ছবি এসেছিল মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলকাতা, লখনৌ ইত্যাদি অনেক জায়গা থেকে, এমনকী ত্রিপুরার রাজদরবার থেকেও শশী হেসের আঁকা তৈলচিত্রও নেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য ভারতীয় শিল্পীর আঁকা তেলরঙের ছবির একটা বিভাগ করা হয়েছিল। ও.সি গাঙ্গুলি দিলেন ভারতীয় ভাস্কর্যের একাধিক আলোকচিত্র। লখনৌ মিউজিয়াম থেকেও এসেছিল নানা শিল্পসামগ্রী, লাহোর মিউজিয়াম থেকে শিল্পী সমরেন্দ্র গুপ্ত পাঠিয়েছিলেন অনেক ছবি। তবে ছবি নির্বাচন ও সমগ্র পরিকল্পনা ছিল নন্দলালের। কলকাতা থেকে অবনীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, সুরেন কর প্রমুখ শিল্পীদের ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছিল সেই অসামান্য প্রদর্শনী। বলা বাহুল্য, নন্দলালের এই অসাধারণ আয়োজনে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। পরের বছর আবার নন্দলালের ডাক এল গান্ধীজীর কাছ থেকে। এবার ১৯৩৭-এর ফেতেপুর কংগ্রেস মণ্ডপসজ্জার ভার তাকেই নিতে হবে। নন্দলাল এবার কিছুটা শঙ্কিত ও বিরক্তবোধ করলেন। আগেরবার লখনৌ কংগ্রেসে ছিল প্রদর্শনীর আয়োজন, কোনো অসুবিধা ছিল না। এবারে কিনা মণ্ডপসজ্জা! চিন্তিত নন্দলাল জানালেন, তিনি আর্কিটেকচারের কাজ কখনো করেননি, তিনি চিত্রকর, কীভাবে করবেন এই বিপুল কাজ? কিন্তু গান্ধীজীও দমার পাত্র নন; তিনি বললেন, কোনো বড়ো ইঞ্জিনিয়ার তিনি চান না। প্রখ্যাত পিয়ানিস্টে তাঁর কাজ নেই। কেবল একজন বেহালাবাদক হলেই তাঁর কাজ চলবে। তিনি আরো বললেন—''তুমি সাহস কর, তুমি আর্টিস্ট, তুমি পারবে। তুমি এসে সেবাগ্রামে আমার সঙ্গে দেখা করবে।'' এরপর আর কথা চলে না। গান্ধীজীর নির্দেশ পেয়ে নন্দলাল সেবাগ্রামে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বরোদার মহারাজের কীর্তিমন্দির অলঙ্কৃত করার দায়িত্ব পান। শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের দেওয়ালচিত্র নন্দলাল বসুকে খ্যাতিমান করে তোলে। এখানেই শেষ নয়, ভারত সরকারের সর্বোচ্চ পুরস্কারগুলির এমব্লেমের নকশাও এঁকেছিলেন স্বয়ং নন্দলাল বসু। তারমধ্যে আছে ভারতরত্ন, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী। আজ যে পুরস্কারগুলি আমরা খবরের কাগজে বা টিভিতে দেখতে পাই সেগুলোর স্রষ্টা কিন্তু তিনিই। এই পুরস্কারের নকশা ছাড়াও মানপত্রের সচিত্রকরণও তার হাতে তৈরি। নিজেও পেয়েছিলেন পদ্মবিভূষণ সম্মান। আর তাঁর নেতৃত্বেই ভারতের এই মহান সংবিধানের অলঙ্করণের কাজ সম্পন্ন করেন জব্বলপুরের বাসিন্দা চিত্রশিল্পী রাম মনোহর সিনহা। পুরো সংবিধানটি ছাপা হয় ফটো লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে, দেরাদুনের সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে। জওহরলাল নেহরুর ইচ্ছে ও অনুরোধে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু মোট বাইশটি ছবি আঁকেন সংবিধানে। তারমধ্যে বেশিরভাগই মিনিয়েচার (আক্ষরিক অর্থে সূক্ষ্ম বা অতি ক্ষুদ্র) ঘরানার। আর এই সবকটি ছবির মূল বিষয় ছিল ভারতের সংস্কৃতি। পুরাণ থেকে ইতিহাস— সমস্ত কিছুই ছুঁয়ে গিয়েছিল তাঁর তুলি। সেখানে যেমন ছিল রামায়ণ-মহাভারতের দৃশ্য, তেমনই ছিল গুরুকুল বা বৈদিক আশ্রমের দৃশ্য। সবমিলিয়ে সংবিধানের অলংকরণ যেন ভারতের চিত্রিত ইতিহাস— এক ভুগোল কথা। ভারতের ঐতিহ্যের ছবি সংবিধানের পাতায় পাতায়। ধর্ম, ঐক্য, বোধ, সমাজ, ত্যাগ, জাতীয়তাবাদ, দেশ গঠন, জাতির স্বপ্নের গভীর সম্পর্ক রয়েছে এই ছবিগুলির সাথে। এমন নকশা মণ্ডিত সংবিধানের পৃষ্ঠা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল বলা যায়।

আরো আকর্ষণীয় বিষয় হল, সংবিধানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে আঁকা হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের ছবি। যেমন সংবিধানের ১৫৪ নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে ইমার্জেন্সির কথা, আর সেই পৃষ্ঠার ছবির বিষয় রয়েছে গান্ধীজীর নোয়াখালির দাঙ্গা কবলিত এলাকা ভ্রমণ। যে পৃষ্ঠায় রয়েছে কর্মদ্যোম দিয়ে দেশ গঠনের প্রসঙ্গ, সেখানে রয়েছে বাদশাহ আকবরের ছবি। বাণিজ্যের প্রসঙ্গে এসেছে মহাবলীপুরমের সেই ছবি যেখানে রয়েছে গঙ্গা অবতারণের দৃশ্য, এর অর্থ নদীপথ তৈরি হচ্ছে। প্রথমে ছবি তারপর ইংরেজি ক্যালিগ্রাফিতে লেখা সংবিধান এভাবেই অপূর্ব হয়ে উঠেছিল হাতে লেখা আসল সংবিধান।

সংবিধান সভার ৩০৮ জন সদস্য ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি তারিখে সংবিধানের দুটি হস্তলিখিত কপিতে স্বাক্ষর করেন। আর তার ঠিক দু'দিন পর এই সংবিধান প্রয়োগ করা হয় সমগ্র দেশে। স্বাধীন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণতন্ত্র। সংবিধান যখন লেখা হয়, তখন মূল প্রতিলিপিটি প্রাথমিকভাবে একটি ফ্লানেলের কাপড়ে মুড়ে তাতে ন্যাপথলিনের বল দিয়ে সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। তবে ১৯৯৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের এক সিদ্ধান্তে আমেরিকার মতো ভারতের সংবিধানের মূল কপিটি সংসদ ভবনের গ্রন্থাগারে হিলিয়াম গ্যাস ভর্তি বিশেষ বাক্সে সংরক্ষিত রাখা হয়। আর তার জন্য দেশের 'ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটারি' এবং আমেরিকার 'দ্যা গেটি ইনস্টিটিউট'-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং বর্তমানের হিলিয়াম গ্যাস চেম্বারটি তৈরি হয়। তার পিছনে কারণ ছিল সংবিধানের মূল কপিটি কালো কালিতে লেখা এবং এই কালি খুব দ্রুত জারিত হয়ে যায় বলে এটি সংরক্ষণ করার জন্য প্রতি ঘনমিটারে ৫০ গ্রাম আর্দ্রতার প্রয়োজন। তাই ভারতের সংবিধান সংরক্ষণের জন্য এয়ারটাইট হিলিয়াম গ্যাস চেম্বার তৈরি করা হয় এবং বর্তমানে এটি সেখানেই সংরক্ষিত। পরিশেষে একটি পরিতাপের বিষয় উল্লেখ করেই লেখার ইতি টানব—সমগ্র দেশ জুড়ে বর্তমানে স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ উপলক্ষ্যে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' পালন করা হচ্ছে, সংবিধানের মূল কপিটি সংরক্ষণের জন্য সমস্ত আধুনিক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে, কিন্তু একটিবারের জন্যও স্মরণ করা হচ্ছে না হিন্দু বাঙালি নন্দলাল বসুকে। □

রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর লম্ফঝম্প

ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী

রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিগত দুটি সাধারণ সভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান যে ভারত-বিরোধী ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বিরোধী বক্তব্য পেশ করেছেন, তা সমস্ত শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার মতো মঞ্চ, যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মঞ্চ হিসেবে বিবেচিত হয়, সেখানে একটি রাষ্ট্রপ্রধানের থেকে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মিথ্যাচার, কুৎসা ও অপপ্রচার একেবারেই অনভিপ্রেত। অন্য একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্রের প্রধান

যখন এই মঞ্চে নিজের রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, বিশ্ব-শান্তি ও প্রগতির কথা বলেন, সেই একই মঞ্চে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর এহেন আচরণ, সংশ্লিষ্ট দেশটির রাজনৈতিক দেউলিয়াপনাকেই সুচিত করে।

সম্মানীয় ইমরান খান সদ্য সমাপ্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় ২৫ মিনিট ৩১ সেকেন্ডের বক্তৃতায় প্রায় ৭ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড সময় ব্যয় করেছেন বিজেপি-আরএসএসের মুণ্ডপাত করতে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মতো মহান মঞ্চে, একটি প্রতিবেশী দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথা বলে শুধু ওই মঞ্চেরই অপব্যবহার করেননি, ভাবমূর্তিকেও কলুষিত করেছেন। ঠিক কী বলেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী? তিনি বলেছেন, 'বিশ্বের সবচেয়ে কদর্য মুসলমান পীড়ন চলছে ভারতে। ঘৃণাভরা, উগ্র হিন্দুত্ববাদ ছড়াচ্ছে বিজেপি-আরএসএস। ভারতের ২০ কোটির শক্তিশালী মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিংসা এবং আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে'। এছাড়াও মসজিদ ধ্বংসে উস্কানি, অতীত মুসলমান শাসনের ঐতিহ্য ধ্বংস-সহ অনেক ভ্রান্ত অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত করেছেন বিজেপি-আরএসএস-কে। এই অভিযোগের সারবত্তা কতটা তা এখানে যাচাই করা যেতে পারে। শুরুটা করি একটা পরিসংখ্যান দিয়ে। ১৯৪৭ সালে ভারত যখন বিভাজিত হয়, তার ঠিক পরে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে ১৯৫১ সালের প্রথম আদমসুমারি অনুযায়ী মুসলমান জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৯.৮ শতাংশ। আর ২০১১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী বর্তমান ভারতের মুসলমান জনসংখ্যা ১৪.২ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় দেশ ছেড়ে অন্যত্র যায়নি। তাঁদের সংখ্যাধিক্য প্রমাণ করে যে তাঁরা ভারতকে নিরাপদ বাসস্থান হিসেবে মনে করেন তাই দেশ ছাড়েননি ও কোনো দমন পীড়নও হয়নি। অথচ স্বাধীনতা- পরবর্তী অধ্যায়ে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু জনসংখ্যার পরিসংখ্যান অন্য চিত্র তুলে ধরে। স্বাধীনতা পরবর্তী পাকিস্তানে ওই দেশের হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ-সহ সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কমেছে, রাষ্ট্র সন্ত্রাসের কারণে। পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর দমনপীড়ননীতি আরোপিত হয়েছে ইমরানের পূর্বসূরীদের সময়ে ও বর্তমানে তার নিজের জমানায়। তথ্য, পরিসংখ্যান ও প্রমাণ বলছে ভারত নিজ দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর কোনোরকম দমননীতি নেয়নি। পাক প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দ্বিচারিতা ও পরস্পর-বিরোধিতায় ভরা। তিনি বলছেন,

> "যে তালিবানি শাসনে আফগান আমজনতার নাভিশ্বাস উঠছে, যে শাসন থেকে বাঁচতে অনেকে দেশ ছেড়েছেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সেই ধর্মান্ধ স্বৈরাচারীদের আরও ক্ষমতায়ণ ও তাঁদের সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের কথা বলছেন।"

মুসলমানরা ভারতে শক্তিশালী, আবার তারপরে বলছেন, ভারত তাঁদের ওপর দমন পীড়ন চালাচ্ছে। একটি জনগোষ্ঠী যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে তাঁদের ওপর পীড়ন কে চালাতে পারে? আর ভারতে মুসলমানরা শক্তিশালী, এই কথা বলে আপনি পরোক্ষে স্বীকার করে নিলেন ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রকৃত ক্ষমতায়ণ হয়েছে এবং তা হয়েছে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতাতেই।

পাক-প্রধানমন্ত্রী আরএসএস-এর হিন্দুত্ববাদ নিয়ে বড়ো বড়ো কথা বলেছেন। তিনি কি জানেন হিন্দুত্ব বলতে সঙ্ঘ কি বোঝায়? হাজার হাজার বছর ধরে এই প্রাচীন ভারতীয় ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী প্রতেকটি ব্যক্তিই হিন্দু, তাঁদের ধর্ম ও উপাসনাপন্থা যাই হোক। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সনাতনী, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন সবাই হিন্দু অর্থাৎ হিন্দু একটি জাতির নাম, কোনো ধর্ম নয়, আর হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদের প্রতীক। আসলে হিন্দুত্ববাদ, বহুত্ববাদ ও সাম্যবাদকে ইমরানের মতো মধ্যযুগীয় মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। জিহাদের চশমা দিয়ে দেখে ভারতকে মূল্যায়ন করাও সম্ভব নয়। তিনি যে সংগঠনগুলিকে ভ্রান্ত অভিযোগে বিদ্ধ করছেন, তারই একটি সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক পূজ্য ভাগবতজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন মুসলমান সম্প্রদায় ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। হিন্দুরাষ্ট্র নির্মাণ অসফল হবে, যদি মুসলমানরা তাতে যোগদান না করে। তিনি আরও বলেছেন, গোরক্ষার নাম করে যদি কোনো ব্যক্তি ভারতীয় মুসলমানদের শারীরিকভাবে আঘাত করে, তাহলে তিনি হিন্দু নন। আর একটি সংগঠন বিজেপি দল থেকে নির্বাচিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, তাঁর সরকার সব কা সাথ, সব কা বিকাশ ও সব কা বিশ্বাস-এর মন্ত্র নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

ইমরান খান আরও বলেছেন, ভারত নাকি অতীত মুসলমান শাসনের ঐতিহ্য ও চিহ্ন উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত ভাবে ধ্বংস করছে। প্রশ্ন উঠবে, মধ্যযুগীয় ইসলামি শাসনের ঐতিহ্য কি সত্যিই সংরক্ষণ করার মতো? পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত হানাদাররা ভারতে নিজেদের শাসনব্যবস্থা কায়েম করে হাজার হাজার বছর ধরে লালিত সনাতনী ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সাহিত্য ও বিশ্বাসকে পদদলিত করেছে। ভ্রাতৃহত্যা, ক্ষমতালিপ্সা, অ-ইসলামীয়দের প্রতি অকথ্য অত্যাচার, তাঁদের উপাসনাগৃহ ধ্বংস করা, অবাধেই লুটতরাজ, হত্যালীলা, রক্তপাতের সাক্ষী আমাদের ইতিহাস। পাক প্রধানমন্ত্রী কি এই অপসংস্কৃতি ও নিম্নবর্গীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের কথা বলছেন? এই দৃষ্টান্ত তো মনে রাখার মতো নয়, উদযাপন করার মতো নয়, ভুলে যাবার মতো! এই প্রসঙ্গে ভারতের কিছু রাজ্যের কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী ধন্যবার্দাহ, বিশেষত উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী— যিনি তাঁর রাজ্যের কিছু শহরের নাম যা মধ্যযুগীয় হানাদার শাসকরা পরিবর্তন করেছিল, তা তিনি আবার আগের নামে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যযুগীয় মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর আরও একটি বক্তব্য থেকে। তিনি বলেছেন, আফগানিস্তানের সাধারণ জনতার কল্যাণের জন্যই তালিবানের ক্ষমতায়ণ ও তালিবান সরকারের স্বীকৃতি প্রয়োজন। ভাবুন, যে তালিবানি শাসনে আফগান আমজনতার নাভিশ্বাস উঠছে, যে শাসন থেকে বাঁচতে অনেকে দেশ ছেড়েছেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সেই ধর্মান্ধ স্বৈরাচারীদের আরও ক্ষমতায়ণ ও তাঁদের সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের কথা বলছেন। আর কত ছোটো ও হাস্যাস্পদ করবেন উনি নিজের দেশটাকে?

পাক প্রধানমন্ত্রী বরং নিরপেক্ষ ভাবে কোনো ঘটনাকে দেখতে শিখুন। মুসলমানদের প্রতি দমন পীড়ন যদি কোথাও হয়েই থাকে, তাহলে সেটা ভারতে নয়, চীনে। চীন তাদের দেশে উইঘুর সম্প্রদায়ের মুসলমানদের ওপর কী অকথ্য অত্যাচার করছে, সেটা দেখুন। অবশ্য সকলেই জানে চীনের চোখে চোখ রেখে কথা বলা ও এইসব ঘটনার প্রতিবাদ করার হিম্মত পাকিস্তানের নেই। পাকিস্তানের পোষিত জঙ্গি সংগঠন 'আলকায়দা' প্রেসবার্তা জারি করে প্রতিবাদ করেছিল কয়েক মাস আগে, কিন্তু তড়িঘড়ি ইমরান প্রত্যাহার করিয়েছেন 'আলকায়দা'কে দিয়ে। সারা বিশ্ব সেদিন দেখেছে পাকিস্তানের অসহায়তা। যাইহোক, এই ঘৃণ্য ও অসত্য ভাষণের প্রতিবাদ করার জন্য ভারতের নারীশক্তিই কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে বিগত কয়েক বছর ধরে। ২০১৯ সালে একই ধরনের বক্তব্যের প্রতিবাদ সরকারি করেছিলেন ভারতীয় তরুণী আমলা বিদিশা মৈত্র, আর ২০২১-এ একই কাজ করলেন স্নেহা দুবে। □

আগামী দশ বছরে কি পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান শাসিত রাজ্য হতে চলেছে?

স্বাধীনতার পর এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে একটি সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোট ছাড়াই নির্বাচিত হয়েছে যা ভারতের ইতিহাসে এক নজির বিহীন ঘটনা। এই ভোট স্মরণ করিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আগামীদিনে একটি মুসলমান শাসিত রাজ্যের মর্যাদা পেতে চলেছে। এবারের বিধানসভা ভোটে মুসলমান বিধায়কের সংখ্যা ৪২+১=৪৩ যা রাজ্যের মুসলমান ভোটের আনুপাতিক হারের থেকে কম। আগামী নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুসলমান জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে আসন বন্টন করতে হবে না হলে তাদের সমর্থন হারাতে হবে। এতদিন মুসলমানরা বাম কংগ্রেস শিবিরে বিভক্ত ছিল। এবারের নির্বাচনে মুসলমানরা প্রমাণ করেছে তাদের মিলিত শক্তি আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের সরকার গঠনে মূল নির্ণায়কশক্তি হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটারের সংখ্যা ৭২৮১০৭১০। এবারের নির্বাচনে কাস্টিং ভোটের সংখ্যা ৫৯৯০০৪২৬। এর মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে ২৮৭৩৫৪২০ ভোট শতকরা হার ৪৭.৯ শতাংশ আর বিজেপি পেয়েছে ২২৮৫০৭১০ ভোট শতকরা হার ৩৮.১৩ শতাংশ। অন্যান্যদের ভোটের সংখ্যা ছিল ৮৩১৪২৯৬ = ১৪ শতাংশ। প্রাপ্ত ভোটের পরিসংখ্যানে বিজেপির থেকে তৃণমূল ৫৮৮৪৭১০ ভোট বেশি পেয়েছে। এবারের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে বিভিন্ন সূত্রমতে মসলমান ভোট পড়েছে ৯৫ শতাংশ তার মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে ৯১ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা ২৭.০১ শতাংশের হিসেবে ২৪৬৫৪৮২৫ জন। আনুপাতিক হারে তাদের ভোটের সংখ্যা ১৯৬৬১৭২। এর মধ্যে প্রাপ্ত ভোটের ৯১ শতাংশ হিসেবে ভোটের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ। অর্থাৎ টিএমসির প্রাপ্ত ভোট ২৮৭৩৫৪২০-এর মধ্যে মুসলমান ভোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ। এখন এই ১ কোটি ৮০ লক্ষ ভোটার আগামী ৫ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে হবে প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ। এই দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ভোটারের আনুপাতিক আসন সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১১০। এই সংখ্যা হবে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের প্রধান হাতিয়ার। তখন মুসলমান সম্প্রদায় বাম কংগ্রেসের মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তখন আজকের মিনি পাকিস্তানের স্বপ্ন হবে ভবিষ্যতের পূর্ণ পাকিস্তান।

এছাড়া আরও একটি পরিসংখ্যান বলছে আগামী ১০ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নিশ্চিত ভাবে একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে পরিণত হবে। কারণ—

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৯-১১ বছর বয়েসীদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ। এর মধ্যে ৯ শতাংশ হিন্দু ও ১১ শতাংশ মুসলমান। মাত্র ১০ বছর পর ২০৩১ সালে এরা ১৮ বছর পেরিয়ে ভোটাধিকারের অধিকার পাবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ভোটারের সংখ্যা যদি ৩০ শতাংশ ধরা হয় তাহলে আগামী ১০ বছর পর অর্থাৎ ২০৩১ সালে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে একচল্লিশ শতাংশে। যদি তাই হয় তাহলে ২০৩১ সালে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে ২৯৪ সিটের মধ্যে পার্সেন্টেজের হিসেবে তারা ১৭০/১৮০ সিট দখল করবে। পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়তে লাগে ১৪৮ সিট। সুতরাং মাত্র ১০ বছর পর পশ্চিমবঙ্গ হবে একটি ইসলামিক রাজ্য।

শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয় দেশভাগের পর থেকে এই বিশেষ সম্প্রদায়টিকে ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করে জাতীয় কংগ্রেস কমিউনিস্ট পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেস দেশের অখণ্ডতা নিরাপত্তা এবং ভারতীয় ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে একটি বিপদজনক রাজ্যে পরিণত করেছে। অলিখিত ভাবে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের উপর এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যার কিছু অতীতের রেকর্ড আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

আজ থেকে ৩৭ বছর আগে তখন বামেদের জমানা। ১৯৮৪ সাল। দোলের দিন কলকাতার মিনি পাকিস্তান মেটিয়াবুরুজের মাটিতে মুসলমান জেহাদিদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিল একজন সৎ নির্ভীক সাহসী পুলিশ অফিসার DC port IPS বিনোদ কুমার মেহতা। সেদিন বধ্যভূমিতে অভিমন্যুর মতো একটি রডের আঘাত আছড়ে পড়েছিল তার মাথার উপর। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন মাটিতে খুলে গেল মাথার হেলমেট। বলতে লাগলেন, আমি ডিসি পোর্ট তোমরা আমাকে মেরো না। কিন্তু উপর্যুপুরি রড ছুরি চাপাতি আর ইসলামি তলোয়ারের আঘাতে তার শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। নিষ্প্রাণ রক্তাক্ত নিথর দেহটি ইউনিফর্ম খুলে নিরাভরণ দেহটি ফেলে দেওয়া হয়েছিল আটাবাগের একটি কাঁচা নর্দমায়। দেহটি উদ্ধার হয়েছিল কিন্তু যেহেতু ঘটনায় একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম জড়িত তাই সব অপরাধী অধরাই থেকে গিয়েছিল। শোনা যায় এর নেপথ্যে ছিল বামফ্রন্টের কলিমুদ্দিন শামস।

গার্ডেনরিচের হরিমোহন কলেজে নির্বাচনের দিন প্রকাশ্য দিবালোকে ইনস্পেক্টর তাপস চৌধুরীকে গুলি করে মারা হয়েছিল। সে ঘটনায়ও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম জড়িত ছিল। এই কেসে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার রঞ্জিত কুমার পঞ্চনন্দা পুলিশী তৎপরতা চালাতে গিয়ে নাজেহাল হয়েছিলেন।

সিএএ আন্দোলনের সময় একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা সারা রাজ্য অচল করে দিয়েছিল। তারা আস্ত দুটি ট্রেন পুড়িয়ে দিয়েছিল, রেললাইন উপড়ে একাধিক স্টেশনে ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ করে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করেছিল। এদের বিরুদ্ধে পুলিশ একটি এফআইআর-ও করেনি। অথচ এই নাশকতার সঙ্গে দেশের আভ্যন্তরীণ

ফঃ ৩

নিরাপত্তা জড়িত ছিল। এর পিছনে ছিল একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে দেশবিরোধী কাজে উৎসাহিত করা।

১৭ জুন ২০১৭ সালে ভাঙড়ে পাওয়ার গ্রিড নির্মাণ নিয়ে বিরোধিতায় সেখানকার বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা পথ অবরোধ করেছিল। পুলিশ অবরোধ তুলতে গিয়ে আক্রান্ত হয়। জেহাদিরা ১০টি পুলিশের গাড়ি পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিল। পুলিশ উর্দি খুলে পালিয়েছিল। কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের কথা শোনা যায়নি। ২৮ নভেম্বর ২০১৪, সেদিন জামাতে উলেমা হিন্দের নেতা সিদ্দিকুল্লা কলকাতার ময়দানে জনসভার নামে করেছিল এক তাণ্ডব। সেই তাণ্ডবে ৩ জন আইপিএস-সহ ১১ জন পুলিশকর্মী গুরুতর আহত হন ও ১১টি গাড়িতে ভাঙচুর করা হয়। আইপিএস অফিসাররা দৌড়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন ক্লাব তাবুতে। পুলিশ কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি।

২০ অক্টোবর ২০১২ রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর সামনে বাস চাপা পড়ে মহম্মদ আকিল মারা যান। শুরু হলো তাণ্ডব। ৮৬টি বাস ১১টি গাড়ি, ২টি ট্রাম ভাঙচুর হলো। পুলিশ ছিল দর্শক। নীলরতন হাসপাতালের কথা ভুলে গেলেন? সেদিন সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যে ৫ ট্রাক ভর্তি দুয়েল গাই এসে যে তাণ্ডব চালিয়েছিল তা এত তাড়াতাড়ি কলকাতার মানুষের ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

মগরাহাট থানার নৈনান গ্রাম মুসলমান অধ্যুষিত। ১ ডিসেম্বর ২০১১ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের আধিকারিকরা গিয়েছিলেন অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে। গ্রামবাসীরা বিদ্যুৎ কর্মীদের আটকে রাখে। উদ্ধার করতে গেলে পুলিশ আক্রান্ত হয় এবং বাধ্য হয় গুলি চালাতে। এতে ২ জন গ্রামবাসী নিহত হয়েছিল। এটি ছিল একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। কিন্তু এর জন্য ৩ জন পুলিশ কর্মী সাসপেন্ড হয়েছিল।

১৩ জানুয়ারি ২০১৬ রেড রোডে ২৬ জানুয়ারি উপলক্ষ্যে চলছিল কুচকাওয়াজের মহড়া। হঠাৎ একটা OD Q7 গাড়ি দ্রুত এসে সেনাবাহিনীর জওয়ানের উপর তুলে দেয়। এতে মারা গিয়েছিলেন বিমান বাহিনীর উইংকমান্ডার অভিমন্যু গৌড়। এই কেসে ৫৭ জন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান রেকর্ড করার পর আসামি খালাস পেয়ে গিয়েছিল।

২ মে বিধানসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণার দিন কলকাতার বেলেঘাটার অভিজিৎ সরকারকে খুন করা হয়েছিল। তার লাশ এখনো মর্গে পড়ে রয়েছে। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট অভিজিতের মরদেহ দ্বিতীয়বার বিশেষ ব্যবস্থাধীনে পোস্টমর্টেম করার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আদেশ এখনো কার্যকরী হয়নি।

মাত্র এক সপ্তাহ আগের ঘটনা। কুল্টিতে আরমান নামে এক দাগী আসামীকে পুলিশ রাতে তুলে নিয়ে এসেছিল। পরেরদিন সে পুলিশ কাস্টডিতে মারা যায়। প্রতিবাদে পুলিশ ফাড়ি আক্রান্ত হয় এবং ৪/৫টি গাড়িতে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করা হয়। ২ জন পুলিশ সাসপেন্ড হয়। এগুলো যদি একটি গণতান্ত্রিক সভ্য দেশের বিধিবিধান হয়ে থাকে তাহলে কিছু বলার নেই। আর যদি না হয়ে থাকে তাহলে যে যেখানে আছেন সেখান থেকেই এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন নইলে পালানোর পথ পাবেন না।

সামনে অন্ধকার নেমে আসছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের হিন্দু ভাইবোনেদের উপর বর্বোরচিত আক্রমণ তার আভাস দিচ্ছে। তাই এক দেশ এক আইন চালু হোক। চালু হোক জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন। পশ্চিমবঙ্গকে মিনি পাকিস্তান হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বাঙ্গালিদের এক হয়ে এখনই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোণা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

ভোটার হতে গেলে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন

ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। আঠেরো বছর বয়স পূর্ণ হলে যে কোনো নাগরিক ভোটধিকার প্রয়োগের অধিকারী। নিয়ম অনুযায়ী তিনি (ছেলে বা মেয়ে) ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারবেন। নির্দিষ্ট সময়ে ভোটাধিকার প্রয়োগও করতে পারবেন। এটাই নিয়ম এবং স্বাভাবিক। যেহেতু একটা ভোটও হার জিত নিশ্চিত করে, তাই প্রতিটি ভোটই অত্যন্ত মূল্যবান। দেশ নির্মাণের এই চাবি যাদের হাতে, তাদের কিছু জিনিস তাদের জানা প্রয়োজন। তাই নিয়ে কয়েকটি কথা—

(১) ইতিহাস জ্ঞান, ৭৫০ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস জানা অত্যন্ত জরুরি (মহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু জয় থেকে ভারতের স্বাধীনতা)। এই সময়কালে দেশীয় নৃপতিদের দেশ শাসন এবং বহিঃশত্রুদের ভারত শাসন, শোষণ, অত্যাচার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। এর মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতা লাভ থাকবে।

(২) ভূগোল : কোন কোন অঞ্চল নিয়ে ভারতবর্ষ গঠিত ছিল? সেই সব অঞ্চলের মধ্যে অনেক অঞ্চল এখন আর ভারতের অংশ নেই। সেই অঞ্চলগুলি কী কী এবং কেন ভারতের মধ্যে নেই?

(৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান : কোন কোন দেশ আমাদের প্রতিবেশী? তারা ভারতের কাছে কী চায়? ভারতই বা তাদের সঙ্গে কী সম্পর্ক রেখে চলতে চায়? এটা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বোঝা দরকার।

(৪) পৌরনীতি বা পুরনীতি : ভারতবর্ষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অতীত, বর্তমান জানা ও বোঝা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে কোন পথে এগোলে ভারতের সঠিক মঙ্গল হতে পারে? সেই দর্শন থাকা দরকার।

এসব নিয়ে কোনো পুস্তক বা সিলেবাস রচনা করা হোক। যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করে নবীন ভোটারদের পাঠদানের ব্যবস্থা করা হোক। (নির্দিষ্ট সময় কাল ধরে)। পাঠদান শেষে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। নির্দিষ্ট যোগ্যতামান অর্জন করতে পারলেই নবীন ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। সবার জন্য এই নিয়ম প্রবর্তিত হলে আরও ভালো হয়।

—অজয় বিশ্বাস,
বৈষ্ণবঘাটা, পাটলি, কলকাতা-৯৪।

স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারত নির্মাণে মেয়েরা

অঞ্জনা পায়রা

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর নির্বাচিত সংবিধান পরিষদ দ্বারা সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি চূড়ান্ত সংবিধান গঠিত হয়। ভারতীয় সংবিধানের জনক ডাঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ছিলেন সংবিধানের প্রধান স্থপতি। এই সংবিধান তৈরির কাজে ১৫ জন মহিলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধান পরিষদের সদস্য হিসেবে যারা সংবিধান রচনা করেন তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এই মহিলারা।

ভারতের প্রথম মহিলা গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হন 'ভারতের নাইটেঙ্গেল' সরোজিনী নাইডু।

ভারতছাড়ো আন্দোলনের নেত্রী সুচেতা কৃপালনি উত্তরপ্রদেশ সরকারের শ্রম, কমিউনিটি উন্নয়ন ও শিল্পমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে লহণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণকারী দুর্গাবাঈ দেশ ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে তিনি পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হন। একদা লোকসভা সদস্য কমলা চৌধুরীও লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নিয়েছিলেন।

ভারতের প্রথম স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কৌর টিউবারকুলোসিস অ্যাসসিয়েশন অব ইন্ডিয়া ও সেন্ট্রাল লেপ্রসি অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা।১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভাপতি বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত ছিলেন জহরলাল নেহরুর বোন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহিলা হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছিলেন। সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভের দু'বারের (১৯৪৩-৪৬ ও ১৯৫২-৫৭) সদস্য রেণুকা রায় লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে স্নাতক হয়েছিলেন।

বিশ্বভারতীয় ছাত্রী মালতী চৌধুরী, লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উত্তরপ্রদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মুখ পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় মহিলা সমিতি গঠন করেন আমাদের লীলা রায়। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত, কন্সটিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির একমাত্র মুসলমান মহিলা সদস্য বেগম আইজাজ রসুল।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ওমেন্স ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশান গঠন করেন আমু স্বামীনাথন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কন্সটিটিয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সদস্য। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে লোকসভায় ও ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যসভার নির্বাচিত সদস্য।

স্বাধীনতাপূর্ব যুগের দলিত নেত্রী দক্ষিণী বেলায়ুদান, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কোচিন আইনসভার সদস্য এবং ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কন্সটিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সদস্য। একাধারে সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, লেখিকা হংসা জিভরেজ মেহেতা ১৯৪৫ থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি দেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেছিলেন।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহিলা সাংসদ, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের স্বাস্থ্য ও বিদ্যুৎমন্ত্রী হয়েছিলেন অ্যানি স্যাস্ফরিন। ভারতীয় সংবিধানের রচনায় ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার সমানাধিকার গুরুত্ব পেয়েছিল। মহিলাদের জন্য বেশ কিছু সাংবিধানিক ব্যবস্থাও ছিল। সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। মৌলিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সাম্য (ধারা ১৪), রাষ্ট্রের করা বৈষম্য না হওয়া (অনুচ্ছেদ ১৫ (১) ও ধারা ৪২) কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া সংবিধানে নারী ও শিশুদের জন্যে রাজ্য কর্তৃক বিশেষ অধিকার বিধান প্রণয়নকে, সাম্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহিলা অবমাননা ঠেকানোর জন্য তার বিরোধিতা করে (আর্টিকেল ৫১এ, ই) এবং কাজকর্মের অনুকুল সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি করে। মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা যাতে রাজ্য সঠিক সময়ে করতে পারে তার ব্যবস্থা ও ভাবা হয়েছে। মৌলিক কর্তব্যগুলির মধ্যে নারীজাতির মর্যাদা হানিকর সব প্রথাকে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে।

ভোটাধিকার ও নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও মহিলাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কিছু সামাজিক আইনও প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন সময়। যেমন— ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের কিছু বিবাহ আইন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের কমমজুরী আইন।

এতো বছর ধরে সংবিধানে নারী স্বার্থরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, আইন হয়েছে কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে তা বলবৎ হয়নি এবং ভারতের অধিকাংশ মহিলা এ সম্পর্কে সচেতন নয়। আজকের দিনে জাতির সার্বিক এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে আইনবলবৎ ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ◻

ভয় থেকে মুক্তি পেতে কী করবেন

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

মানুষের এক বিশেষ অনুভূতি হলো ভয়। ভয় দুই রকমের হয়— এক বাহ্যিক ভয় আর দুই, মানসিক ভয়। প্রথম ভয়ের উৎস বাইরের কোনো বাস্তবিক ঘটনা। এই ভয় কিছুটা থাকা দরকার। যেমন, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, উষ্ণতা, সাপ প্রভৃতি। এই ভয় মানুষকে সাবধান ও সুরক্ষিত রাখে। আগামী দিনের সম্ভাব্য বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। দ্বিতীয় ভয় হলো কোনো কাজ করার ভয়। তবে, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড়ো ভয় করোনা। যে হারে প্রতি মুহূর্তে সংক্রমণের হার ও প্রিয়জনের মৃত্যুর হার বাড়ছে, তাতে সবাই মৃত্যুর ভয়ে ভীত।

কেন আমরা ভয় পাই : ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টারের মনোবিজ্ঞানী ড. ওয়ারেন ম্যানসেল বলেছেন, 'এটা জীবনবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত ও এর মূল ব্যাপার হচ্ছে টিকে থাকা। যে কোনো ধরনের ভীতি বা ঝুঁকির মুখে পালানো বা ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের শরীরের একটা প্রস্তুতি থাকা দরকার।' সমাজবিজ্ঞানী ড. মারগিকের বলেছেন, ভয়ের কারণ দ্রুত শনাক্ত করা ও পরিত্রাণের উপায় বের করা জরুরি। এটাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।' বেশিরভাগ সময় মানুষ ভয় পেলে বা ভীতিকর পরিস্থিতির মুখে পড়ে তা সামলানোর চেষ্টা করে অথবা সেই পরিস্থিতির মুখে পালিয়ে যায় বা পুরোপুরি এড়িয়ে যায়। এ সময় মানুষের হার্টের গতি বেড়ে যায়, বা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তবে, অনেকেই ওই পরিস্থিতি সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করে। কেউ আবার ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে যান এর কারণ মূলত যে ধরনের ঘটনা ঘটছে তা সামলানোর মতো তাঁর কোনো মানসিক প্রস্তুতি নেই।

মৃত্যুভয় কেন হয় : সবচেয়ে বড়ো আমাদের মৃত্যুভয়। নিশ্চিত জেনেও আমরা প্রতি পদে পদে মৃত্যুকে ভয় পাই। আসলে মরণের পরের জগৎ আমাদের কাছে অজানা, তাই আমরা এত ভয় পাই। সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে আমরা কেউ যেতে চাই না। তাই এত ভয়।

ভয় কাটানোর উপায় কী : মনোবিদ অভিষেক হংস জানান, মানসিক ভয় কাটানোর সহজ উপায়— ডায়েরি লেখা। প্রথমত, আপনারা ভয়ের সঠিক কারণটা খুঁজে বার করুন। একটু ভেবে দেখা দরকার, আদৌ সেখানে ভয় পাওয়ার মতো কোনো বিষয় রয়েছে নাকি অহেতুক দুশ্চিন্তা করে আপনি আপনার ভয়টা বাড়িয়ে তুলছেন। আপনার ভয়ের সব কারণ কী, তা ১, ২ এভাবে ক্রম করে ডায়েরিতে লিখে ফেলুন। কিছুটা সময় নিয়ে সব বিষয় নিয়ে ভাবুন। নিজেকে সঠিক প্রশ্ন করুন। এর থেকে উত্তরণের সঠিক উপায় কী হতে পারে তা নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠুন। নিজের ভয়কে জানার চেষ্টা করুন। এরপর এর থেকে বেরোনোর জন্য আপনি নিজে কী কী করতে পারেন তার একটা তালিকা তৈরি করুন।

সমস্যার মুখোমুখি হন : জীবনের কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা করুন। এই জীবনে যখন তখন যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে আমাদের সঙ্গে। এই সময় মানসিক প্রস্তুতি আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নিজেকে বলুন যে কোনো পরিস্থিতির জন্য আমি তৈরি। জীবন মানেই সমস্যা থাকবে। দূর থেকে ছোটো সমস্যাও অনেক বড়ো মনে হয়। তাই সমস্যা দেখে ভয় না পেয়ে তার মুখোমুখি হোন। মনে রাখবেন, সব সমস্যার ভেতরে সমাধান লুকিয়ে থাকে।

ভুল বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসুন : কিছু কিছু বিশ্বাস আমরা অবচেতন ভাবে মেনে চলি। সমাজ, পরিবার যখন কোনো একটা বিষয়কে প্রাধান্য দেয় তখন তাকেই আমরা ধ্রুব সত্যি হিসেবে মেনে চলি। কখনো তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলি না। অনেক সময় মেনে নিতে না পারায় আমাদের ভেতরে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। ভয় বাড়তেই থাকে। হয়তো ছোটো থাকতেই কেউ আপনাকে বলেছিল, আপনি খুব ভীতু। আপনার দ্বারা কাজটা করা অসম্ভব। হয়তো ছোটো থাকতে আপনার কথায় কেউ গুরুত্ব দেয়নি। আপনাকে নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছে। ওই সব কথা অবচেতন মনে গেঁথে যাওয়ার ফলে আজ আপনি ভুল বিশ্বাস নিয়ে চলেছেন। যার জন্য আপনি সাহস করে এগিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছেন। এসব বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

ভয়কে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিন : ভয়ের মধ্যে একটা আলাদা সৌন্দর্য রয়েছে। ভয় আপনাকে কাজ করার জন্য উৎসাহী করতে পারে। যে জিনিস করতে আপনি ভয় পান তাকেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে কাজটা করার চেষ্টা করুন। দেখবেন ধীরে ধীরে তার প্রতি ভয় দূর হচ্ছে।

পজিটিভ অ্যাটিটিউড : 'আমি পারব' এই কথাটা কিন্তু আমাদের ভীতি অনেকটা কমিয়ে দেয়। নিজেকে অভয় দিন। কাঙ্ক্ষিত ফল না হলে কখনো হার মেনে ভয় পাবেন না। কারণ কোনো পরাজয় স্থায়ী নয়।

প্রিয়জনকে শেয়ার করুন : শিশুরা যেমন ভয়ের সব বিষয় মাকে শেয়ার করে একটা সান্ত্বনা লাভ করে, তেমনি কোনো মানসিক ভয়ের বিষয় প্রিয়জনের সঙ্গে শেয়ার করুন। তাঁর পরামর্শ ও সাহস দেওয়া আপনাকে ভয় কাটাতে সাহায্য করবে। ▯

ভারতের সংবিধান কতটা ভারতীয় ?

নিখিল চিত্রকর

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হওয়ার পর ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে স্বাধীন ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়। সংবিধানে মোট ২৪টি অংশে ৪৪৮টি ধারা এবং ১২টি তপশিল রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বের বিভিন্ন সংবিধান থেকে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্যের এক অভূতপূর্ব সংকলন বলা চলে ভারতীয় সংবিধানকে। বহু দেশের কিছু বিশেষ ধারা হুবহু ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ড. বাবাসাহেব আম্বেদকারের নেতৃত্বাধীন কমিটি। ভারতের সংবিধানে বিশ্বের বিভিন্ন সার্বভৌম দেশের সংবিধান থেকে যে ধারাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হলো—

- সংসদীয় সরকার, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের ধারণা, ক্যাবিনেট সংগঠন,

এক নাগরিকত্ব নীতি নেওয়া হয়েছে ব্রিটিশ সংবিধান থেকে।

● মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রপতির ইম্পিচমেন্ট, বিচারপতিদের অপসারণ, আইনি পর্যালোচনা, উপরাষ্ট্রপতির ক্ষমতার বিবরণ ইত্যাদি নেওয়া হয়েছে ইউনাইটেড স্টেটসের সংবিধান থেকে।

● একটি মজবুত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোযুক্ত কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা, কেন্দ্রের কাছে অবশিষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত করা, কেন্দ্রের মাধ্যমে রাজ্যগুলিতে রাজ্যপাল নিয়োগ, সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এক্তিয়ার সংকলিত হয়েছে কানাডার সংবিধান থেকে।

● রাষ্ট্রপরিচালন নীতি, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি, রাজ্যসভার সদস্যদের মনোনয়ন কার্যক্রম এসেছে আইরিশ সংবিধান থেকে।

● যুগ্ম তালিকা (সপ্তম তপশিল), সংসদের যৌথ অধিবেশন, ব্যবসায় স্বাধীনতা, বাণিজ্য ও সহবাস সংক্রান্ত ধারাগুলি অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানের প্রতিরূপ।

● জরুরি অবস্থায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রত্যাহারের ধারণা নেওয়া হয়েছে জার্মানীর ওয়েইমার সংবিধান থেকে।

● প্রস্তাবনায় উল্লেখিত ন্যায়বিচারের আদর্শ (সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক) এবং মৌলিক কর্তব্যের বিবৃতি নেওয়া হয়েছে রাশিয়ার সংবিধান থেকে।

● প্রস্তাবনায় প্রণীত প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতার অদর্শ, সাম্যতা ও সৌভ্রাতৃত্ব নেওয়া হয়েছে ফ্রান্সের সংবিধান থেকে।

● সংবিধানের বিভিন্ন ধারা সংশোধনের পদ্ধতি এবং রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচন প্রণালী উদ্ধৃত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান থেকে।

● আইনসভার মাধ্যমে আইন প্রণয়নের ভাবনা রচিত হয়েছে জাপানের সংবিধানের আদলে।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিকত্ব নিয়ে। সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ধারায় বিদেশি রাষ্ট্রের যোগ থাকায়, অনেকের মতে ভারতীয় সংবিধান তার স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি। অনেকে আবার ভারতীয় সংবিধানকে বিভিন্ন দেশের সংবিধানের 'প্রত্যয়িত' বলে উল্লেখ করেছেন। এই অভিযোগের উত্তরে ভারতীয় সংবিধানের জনক ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর সমস্ত দায় নিজের উপর নিয়ে বলেছিলেন, 'ভালো কিছু ধার করাতে কোনও লজ্জা নেই। এটা চুরি নয়, এটা বিবর্তন। সংবিধানের মৌলিক ভাবনার কোনও পেটেন্ট হয় না। বিভিন্ন দেশের ভালো ভালো নাগরিক ধারাগুলি সংযোজন- বিয়োজনের মাধ্যমে ভারতের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে ভারতীয় সংবিধান আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।' ভারতে সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ছিলেন উচ্চ মেধার অধিকারী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন স্বনামধন্য আইনজীবী। ভারতীয় সংবিধানের তৎকালীন প্রভিশনাল কমিটির প্রধান বল্লভভাই প্যাটেল বলেছিলেন, 'বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান আসে ১৭৮৭ সালে। তারপর থেকে বহু স্বাধীন দেশই সেই সংবিধানের বিবর্তিত রূপ নিজেদের সংবিধানে সংযোজিত করেছে। এক দেশ অপর দেশের সংবিধান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের সংবিধান লিখছে, এমনটা অস্বাভাবিক নয়।' অনেকে নিজের দেশের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক চাহিদা অনুসারে বিবর্তিত সংবিধানে নিজস্বতা যোগ করেছে। তবে ভারতীয় সংবিধানের বেশিরভাগই ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইন'-এর আদলে রচিত। বিশ্বের সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বৃহত্তম সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে ভারতের সংবিধান প্রণেতারা ব্রিটিশদের 'ভারত শাসন আইন'কেই মডেল হিসেবে সামনে রেখেছিলেন।

১৯৩২ সালের নভেম্বরে লন্ডনে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস ওই বৈঠক বয়কট করে। অন্যান্য দল ও সম্প্রদায়ের অনেক কম সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গোল টেবিল বৈঠক পরিচালিত হয়। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে কয়েকটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ নেওয়া। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে। এই বৈঠক এবং পরবর্তী আলোচনার ফলশ্রুতি হিসেবে 'ভারত শাসন আইন' বিধিবদ্ধ হয়। পরের বছর ১৯৩৩ সালে পার্লামেন্টের দুই কক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত জয়েন্ট সিলেকশন কমিটির রিপোর্ট এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রকাশিত শ্বেতপত্র পর্যালোচনা ও সুপারিশের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন রচনা প্রণয়ন করে। সেই সময় কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশবিরোধী কর্মসূচি পালনে ব্রতী হয়। জনসাধারণের বিপুল সমর্থনে ব্রিটিশরাও তখন প্রমাদ গুনছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করে।

ভারত শাসন আইনকে ভারতীয় সংবিধান রচনার মাইলস্টোন বলে মনে করা হয়। ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা এর অধিকাংশ ধারা অক্ষরে অক্ষরে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সংবিধানের বৈশিষ্ট্য, ভারতের রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ক্ষমতা ও তাদের মতামত, সপ্তম তপশিল অনুসারে ক্ষমতার বণ্টন, কেন্দ্র ও রাজ্যের সংসদে দুই কক্ষের উপস্থিতি, এক এবং অধিক রাজ্যের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও জয়েন্ট পাবলিক সার্ভিস কমিশন, দেশের অর্থ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ও দেশের ঋণ নীতির জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গঠন, সুপ্রিম কোর্টের স্থাপনা সংক্রান্ত ধারাগুলি সরাসরি ভারত শাসন আইন থেকে তুলে এনে বসানো হয়েছে। এইসব সাদৃশ্য থেকে মনে হতে পারে ভারতীয় সংবিধান ব্রিটিশদের ভারত শাসন আইনের অনুকরণ মাত্র।

তবে সংবিধান প্রণেতারা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সংবিধান রচনার কাজ করার সময় স্বাধীন ভারতের সমকালীন পরিস্থিতির উপর নজর রেখে ১৯৩৫-এর ধারাগুলিতে বদল এনেছেন। যেমন, ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ভাইসরয়ের যে ক্ষমতা ছিল, ভারতীয় সংবিধানে সেই একই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে পার্লামেন্টকে।

ভারত শাসন আইনে অন্তর্ভুক্ত সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ধারা ভারতের মূল সংবিধানে রাখা হয়নি। এভাবেই ভারত শাসন আইনের ছায়ায় জন্ম হলেও ভারতীয় সংবিধান তার অনন্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। প্রণেতারা শুধুমাত্র ভারত শাসন আইনের উপর নির্ভর করেননি বরং ভারতের সংবিধান তৈরি করার সময় বিশ্বের অন্যান্য সফল সংবিধান থেকে সেরা গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। যে কারণে ১১৭,৩৬৯টি শব্দসংখ্যায় রচিত ভারতের সংবিধান ১১৩টি সংশোধনী নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক সংবিধানের শিরোপায় উজ্জ্বল। ■

ভারতবর্ষের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালন করলাম ঠিক তিন মাস আগেই, ১৫ আগস্ট ২০২১। ২৬ নভেম্বর আসছে। ১৯৪৯, ২৬ নভেম্বর ভারতীয় সংবিধান প্রস্তাবিত হয়েছিল গণপরিষদ দ্বারা। একজন সাধারণ ভারতীয় নাগরিক হিসেবে যখন বিশ্লেষণ করতে বসি যে ভারতীয় সংবিধানে ভারতীয়ত্ব রয়েছে কতখানি, তখন বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসে মনে। সেই প্রশ্নগুলিই আজ আপনাদের সামনে রাখব। চেষ্টা করছি কিছু উত্তর খোঁজারও এবং সঠিকভাবে তা উপস্থাপনা করার।

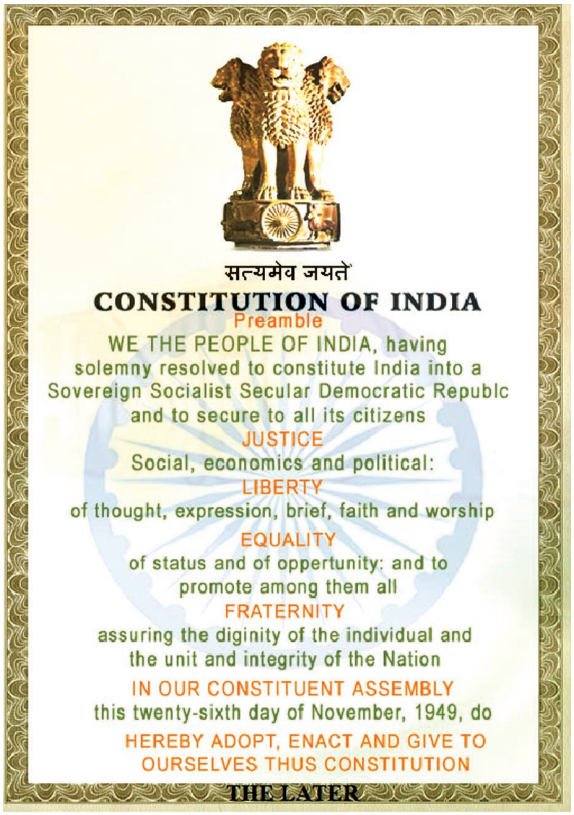

ভারতীয় সংবিধান একটি সাজানো বাগান

অনামিকা দে

● ১৮৫৭ সালের পর থেকে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে যে প্রশাসনিক এবং আইনি ব্যবস্থা চলেছে তার দায়ভার কার বা কোন কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তায়?

● ভারতের কোথায় এবং কখন প্রথম হাইকোর্ট স্থাপিত হয়? এবং সেটি কোন কর্তৃপক্ষ আর কোন সিল-এর তত্ত্বাবধানে?

● ১৮৬১-এ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর থেকে ১৯৪৭, ১৫ আগস্ট আগস্ট অবধি ভারতের ন্যায় বিচার ব্যবস্থার প্রাথমিক কাঠামো কী ছিল?

● 'The Code of Criminal Procedure', 'Indian Evidence Act', 'The Indian Penal Code', 'Civil Procedure' and 'The Police Act'—এই অ্যাক্টগুলি কবে পাশ হয়েছে এবং কোন অথরিটির তত্ত্বাবধানে?

● ভারতীয় সংবিধানের গণপরিষদ বানানো হয়েছিল কার অথরাইজেশনে?

● কে বা কারা গণপরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করেন?

● ভারতীয় সংবিধান বানানোর জন্য ড্রাফ্ট কমিটি কারা বানিয়েছিল?

● ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন ধারার উৎপত্তি কোথায়? ব্রিটিশদের বানানো গভর্মেন্ট অ্যাক্ট ১৯৩৫-এর সঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের কী সাদৃশ্য আছে?

● ভারতবর্ষ কি পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছে? নাকি ব্রিটিশ রাজের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এ ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে?

● ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত আইন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার অধিনে ছিল?

● নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সের রায় বেরোনোর সময় সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় কী ছিল?

● ভারতীয় সংবিধানে ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯-এর গুরুত্ব, প্রাসঙ্গিকতা বা তাৎপর্য কী?

● ভারতীয় সংবিধান ও সুপ্রিম কোর্টের নিরিখে ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০-এর ঐতিহাসিক ও আইনগত তাৎপর্য কী?

● ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কী বিশেষ কোনো নিয়মনীতির দ্বারা পরিচালিত? যদি তা হয় তবে কোন অ্যাক্ট দ্বারা সেই নিয়ম প্রতিফলিত?

● ভারতীয় সংবিধানে মুখবন্ধ বলছে 'We the People..., এর অর্থ কী এই যে আমাদের সংবিধানকে ভারতের প্রথম নির্বাচনের (১৯৫১, ২৫ অক্টোবর— ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)-এর পর জনগণ স্বীকৃতি দিয়েছিল?

● ভারতের পার্লামেন্টে যে অ্যাক্ট পাশ হয় তার iterpretetion করার জন্য 'The General Clauses ১৮৯৭, এর সঙ্গে কোনো কি সম্বন্ধ আছে?

● ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধ (Preamble) কী কখনো সংশোধিত হয়েছে যদি হয় তা কখন এবং কী সেই সংশোধন?

● ভারতীয় সংবিধান বলছে আইন সকল জনগণের জন্য সমান কিন্তু ইন্ডিয়ান পেনাল কোর্ট প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী (Public Servent)-দের জন্য বিশেষ আইনি ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে, এটা কী সঠিক?

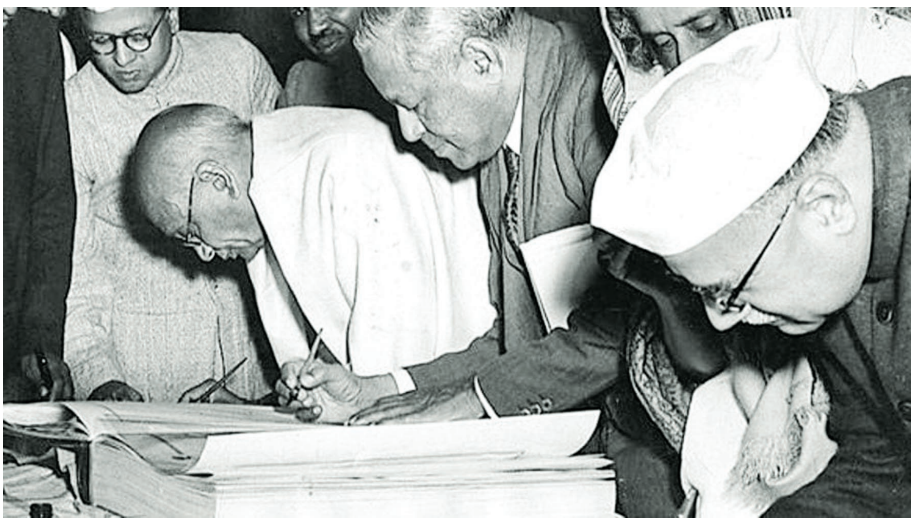

সংবিধান রচনাকালের স্মরণীয় মুহূর্ত।

ঐতিহাসিক তাৎপর্য

ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম প্রশাসনিক ন্যায় বিচার ব্যবস্থা এনেছিল ব্রিটিশ রাজা জেমস ১, একটি চার্টাড়-এর মাধ্যমে যে চার্টাড় দ্বারা ওল্ড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে অনুমোদন করা হয়েছিল। কিন্তু আইনত এটি ও এপ্রিল ১৬৬১ থেকে এটি লাগু হয়, চালর্স ২ আরেকটি চার্টাড় দিয়ে গভর্নর ইন কাউন্সিলের মাধ্যমে কোম্পানিকে এই ক্ষমতাটি দেয়। সর্বোপরি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা সেখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজ করছিল সেখানে, প্রশাসনিক আইন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হয় বিভিন্ন চার্টাড় দ্বারা ১৬৬৯, ১৬৭৪ এবং ১৬৮৬-এ। আমরা দেখতে পাই বম্বে, সেন্ট হেলেনা, সুরাট, ম্যাড্রাস-এ চার্টাড় দ্বারা আইন ব্যবস্থা লাগু করা হয়। এবং কলকাতায় একটি মেয়র কোর্ট স্থাপনা করা হয় ২৪ সেপ্টেম্বর ১৭৭৬ অন্য একটি চার্টাড় দ্বারা (charter of 1776) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নির্দেশ অনুযায়ী এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হতো ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত দুরকম পদ্ধতির দ্বারা। যেসব জায়গায় কোম্পানি রাজ করেছিল।

১৮৫৭ সালে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হওয়ার পরে ১৮৫৮-তে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি বিল আনা হয় যেখানে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সম্পূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব ও আইনি ব্যবস্থা নিজের আয়ত্তে নেয়। ১৮৬১ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি আইন পাশ করে যা দিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আইনি ব্যবস্থার জন্য হাইকোর্ট স্থাপনা করা হয়। যার অনুমতি পাওয়া যায় ১৮৬১ সালের ৬ আগস্ট ব্রিটিশ রাজের থেকে। সর্বোপরি একটি হাইকোর্ট ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল-এ বানানো হয় ১৪ মে ১৮৬২-তে। এরপর গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলকে অধিভুক্ত করা হয় আরও হাইকোর্টে তৈরির জন্য। এরপর আগ্রায় ১৮৬৮-এ আরো একটি হাইকোর্ট স্থাপিত হয় যেটি পরবর্তীকালে স্থানান্তরিত হয় এলাহাবাদে ১৮৭৫-এ। ১৯১১-তে ইন্ডিয়ান হাইকোর্ট আইন পাশ হয় যার দ্বারা ১৮৬১-তে নতুন হাইকোর্ট তৈরির ক্ষমতাকে বন্ধ করা হয়।

১৯৩৫-এ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আরেকটি আইন পাশ করে যার নাম— গভর্মেন্ট অ্যাক্ট ১৯৩৫। যা দিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ফেডারেল কোর্ট স্থাপন করা হয়। এরপর ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকে ফেডারেল কোর্টে আইন ব্যবস্থা কীভাবে চলবে তার গবেষণা চলেছে। এরপরে ১৯৪৮-এ ফেডারেল কোর্টগুলি এনলার্জমেন্ট অব জুরিডিকসন্ অ্যাক্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যেখানে ফেডারেল কোর্টগুলির অধিভুক্ত করা হয় অ্যাপিল শোনার জন্য। এবং প্রিভি কাউন্সিলের কাছে ডাইরেক্ট অ্যাপিলগুলো স্থগিত করা হয় কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া।

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯-এ গণপরিষদের অ্যাক্ট ৫ অব ১৯৪৯ যার দ্বারা appellate juridiction সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট অব ইন্ডিয়া, স্থাপনা করা হয় ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে সেদিন আমাদের ভারতবর্ষে সংবিধানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ওই দিনটিকে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম নির্দেশিকা ১৫ জানুয়ারি (দি সুপ্রিমকোর্ট রুল ১৯৬৬) ১৯৬৬-তে স্থাপনা করা হয়। যা পরবর্তীকালে repealed হয়ে সুপ্রিমকোর্ট রুল ২০১৩-তে তৈরি হয় যার মান্যতা দেওয়া হয় ১৯ আগস্ট ২০১৪-তে।

সুতরাং আমরা দেখলাম ভারতে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ এবং ওই দিনই ভারতীয় সংবিধান গৃহিত হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন দায়িত্বের মধ্যে একটি হলো ভারতীয় সংবিধানকে রক্ষা করা। 'দি সুপ্রিম কোর্ট রুলস, ২০১৩'-এর ইনট্রোডাকশান-এর প্রেক্ষাপটটি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম যাতে সারাংশটি আপনাদের সামনে পরিষ্কার হয়।

সারাংশ

ভারতীয় সংবিধানের উৎপত্তি সম্বন্ধে জেনে এটাই বুঝলাম যে এই সংবিধান বিভিন্ন দেশের সংবিধান এবং ইন্ডিয়ান গভর্মেন্ট অ্যাক্ট ১৯৩৫ থেকে তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে এই ইন্ডিয়ান গভর্মেন্ট অ্যাক্ট ব্রিটিশরা তৈরি করেছিলেন ভারতবর্ষের ওপর শত সহস্র বছর রাজত্ব করার উদ্দেশে। যে বিভিন্ন দেশের সংবিধানের উল্লেখ করলাম সেগুলি হলো আয়ারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউনাইটেড কিংডম, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানি ও জাপান। সুতরাং এই তথ্য পাওয়ার পর এটুকু বুঝলাম যে ভারতীয় সংবিধান একটি 'সাজানো বাগান' যেখানে কোনো বৃক্ষই আমাদের নিজেদের বপন করা নয়।

ভারতীয় সংবিধানে ভারতীয় সংস্কৃতি

অমলেশ মিশ্র

সংবিধানের মূল পুস্তকটি হাতে লেখা এবং সেটি ভারতের সংসদের গ্রন্থগারে সযত্নে রক্ষিত। সংবিধানটি ২৫১ পৃষ্ঠায়, ২২"×১৬" পার্চমেন্ট কাগজে লেখা। ওজন ৩ কেজি ৬৫০ গ্রাম। এটি লিখতে ৪৩২টি কলম ও ৩০৩টি নিব ব্যবহৃত হয়েছিল। নিবগুলি ইংলন্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রস্তুত।

লেখকের নাম— প্রেমবিহারী রায়জাদা। দিল্লির বাসিন্দা। 'কত পারিশ্রমিক নেবেন'— নেহরুজীর এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন— এক পয়সাও নয় তবে প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁর ও তার দাদুর নাম লেখার অনুমতি দিতে হবে। পিতৃহীন প্রেমবিহারী দাদু এবং কাকুর কাছেই বড়ো হয়েছেন। দাদু রামনারায়ণ সাকসেনা ছিলেন সরকারি কর্মচারী, ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত এবং ক্যালিগ্রাফার। ক্যালিগ্রাফিটা (হস্ত লেখা বিদ্যা) প্রেমবিহারী শিখেছিলেন তার কাছেই।

সংবিধান লিখিত হওয়ার ব্যবস্থার পর ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে প্রেমবিহারী শান্তিনিকেতনে আসেন নন্দলাল বসুর কাছে। প্রতি পৃষ্ঠায় অলংকরণ কতটা ও লেখা কতটা হবে তা স্থির হয়। নন্দলাল বসু এবং তার ছাত্ররা প্রতিটি পৃষ্ঠা অলংকরণ করেছেন— ভারতীয় সংস্কৃতির ছাপ আছে এই অলংকরণে। রামায়ণ ও মহাভারতের নানা বিষয়, গৌতম বুদ্ধের জীবনালেখ্য, মোহাঞ্জদাড়োর সিলমোহর, সম্রাট আশোকের ধর্মপ্রচার, বিক্রমাদিত্যের রাজসভা, বাদশাহ আকবর ও তার মোঘল সাম্রাজ্য, মহারানি লক্ষ্মীবাঈ, টিপুসুলতান, গান্ধীজীর আন্দোলন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদহিন্দ বাহিনীর লড়াই, ভারতের পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি, বনভূমি প্রভৃতির চিত্ররূপ দিয়েছিলেন নন্দলাল ও তাঁর ছাত্ররা। সব মিলিয়ে ভারতের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ভূগোলের চিত্ররূপ হয়ে উঠেছিল এই অলংকরণ।

জানা যায় যে, ভারতের সংবিধান বিশ্বের বৃহত্তম তথা দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান। আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. বি. আর. আম্বেদকর ছিলেন গণপরিষদের মূল ব্যক্তি। সংবিধান কমিটি বা গণপরিষদে বিস্তারিত আলোচনা ও বিতর্কের পর সংবিধানের ধারাগুলি চূড়ান্ত হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের— যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আয়ারল্যান্ড প্রভৃতির সংবিধানের প্রভাব ভারতের সংবিধানে আছে এবং ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

কিন্তু ভারতের সংবিধানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব কতটা পড়েছে— তা বুঝতে হলে এই সংবিধানের প্রস্তাবনাটি গভীর ভাবে আত্মস্থ করতে হবে। ভারতের সংস্কৃতি কোনও 'মিশ্র সংস্কৃতি' নয়। যে কোনও সংস্কৃতির মূল বিবেচনার বিষয়— ওই সংস্কৃতিতে কতটা মানবিক ধর্ম ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে। তুলনা করলে বোঝা যাবে যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে মানবিক ধর্ম ও মানবিক মূল্যবোধ প্রাচীনকাল থেকেই মানবশরীরকে শিরায়-উপশিরায় রক্তের মতো প্রবহমান।

বিশ্বে ভারতের মতো প্রাচীন দেশ আরও আছে। সেগুলির সঙ্গে ভারতের পার্থক্য এই যে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব ও ধারাবাহিকতা দুটিই আছে। অন্য প্রাচীন দেশগুলি ধারবাহিকতা রাখতে পারেনি।

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনাটি বাংলা ভাষায় এই রকম :

'আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে ***সার্বভৌম***, ***সমাজতান্ত্রিক***, ***ধর্মনিরপেক্ষ***, ***গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র*** রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে ***সামাজিক***, ***অর্থনৈতিক*** ও ***রাজনৈতিক***, ***ন্যায়বিচার***; ***চিন্তা***, ***মতপ্রকাশ***, ***বিশ্বাস***, ***ধর্ম*** এবং ***উপাসনার*** স্বাধীনতা; ***সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন*** ও ***সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা*** এবং তাদের সকলের মধ্যে ***ব্যক্তির মর্যাদা*** এবং ***জাতীয় ঐক্য*** ও ***সংহতি*** সুনিশ্চিত করণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ***ভ্রাতৃত্বের*** ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদ আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্বারা এই

প্রস্তাবনা ও সংবিধানের ১নং ধারায় দেশটির নাম ইন্ডিয়া বলে উল্লিখিত হয়েছে। ভারতবর্ষ শব্দের ইংরেজি অনুবাদ ইন্ডিয়া নয়। আবার ইন্ডিয়া এবং ভারতবর্ষ সমার্থকও নয়। ইংরেজ শাসকরা ভারতকে 'ইন্ডিয়া' বলত। ১৯৪৭-এর আইনেও ইন্ডিয়া কথাটি আছে। আমাদের সংবিধানের ১নং ধারায় লেখা হলো— India, that is Bharat— একথা লেখা হলো না যে Bharat, that is India.

সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।'

প্রস্তাবনাটির বৈশিষ্ট্য এটি একটি বাক্যে লেখা হয়েছে এবং বাঁকা হরফে মুদ্রিত শব্দগুলির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রাচীনকাল থেকেই ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। যদিও বর্তমানে ওই শব্দগুলির ব্যাখ্যায় ও ব্যবহারে বিকৃতি প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করা যায়।

প্রস্তাবনায় যে উচ্চ আদর্শের বা আদর্শগুলির কথা বলা হয়েছে, দেশের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই আদর্শগুলি অবশ্যই পালনীয়। তবে ভীম সিংজী বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া মামলার রায়ে বলা হয়েছে— Where the language of the enacting Sections is clear and unambiguous the terms of the Preamble (প্রস্তাবনা) cannot qualify or cut down that enactment (AIR 1981 S.C. 244 Para 39 and 71)

প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হয়েছে যে এই সংবিধানের উৎস ভারতের জনগণ। ভারতের জনগণ ঐতিহাসিক কাল থেকে অদ্যাবধি ধারাবাহিক ভাবে বংশ পরম্পরায় এই আদর্শগুলি অনুসরণ করছে এবং এইগুলি ভারতের সংস্কৃতির অঙ্গ।

ফরাসি বিপ্লবে (১৭৮৯) যে স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর ধ্বনি উঠেছিল— তা সারা ইউরোপকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তা আজ থেকে মাত্র ২০০ বছরের আগে। কিন্তু কথাগুলি ভারতীয়রা অনেক আগেই জানত ও অভ্যাস করত জীবনচর্চায়।

খ্রিস্টপূর্ব কালেই সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, মহামান্য পণ্ডিত চাণ্যকের পরামর্শে সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপনের স্বপ্ন রূপায়ণে লক্ষ্য-নিষ্ঠ ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারতেও সার্বভৌম ভারত রাষ্ট্রের কথা জানা যায়।

একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক থেকে জানা যায় যে রাজারা যখন শপথ গ্রহণ করতেন তখন সেই শপথবাক্যে কী বলতেন। তাঁরা বলতেন, আমি যদি অন্যায় অধর্ম ইত্যাদি করি যার ফলে প্রজাদের অমঙ্গল হয়, তাহলে এতাবৎকাল যে পুণ্য আমি অর্জন করেছি তা যেন ব্যর্থ হয় ইত্যাদি।

সম্রাট অশোক, ছত্রপতি শিবাজী প্রজামঙ্গলের সঙ্গে সার্বভৌম রাষ্ট্রব্যবস্থার কথাও ভেবেছিলেন। বিশ্বে সামরিকভাবে শক্তিশালী একটি দেশ যখন শোষণের উদ্দেশ্যে অন্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে তখন উপনিবেশের অধিবাসীরা পরাধীন হয়, স্বাধীনতার দাবি তোলে। কিন্তু এ তো মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা। ভারতে মানবিক ধর্ম ও মানবিক মূল্যবোধের দিকে নজর রেখে সব ধরনের স্বাধীনতার সংস্কৃতি অতি প্রাচীন।

ইতিহাসকে মর্যাদা দিয়ে বলতে হয় ইংরেজ উপনিবেশ ভারতবর্ষ 'স্বাধীনতা অর্জন' করেনি। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হওয়া— ভারতের স্বাধীনতা আইনে রাজার স্বাক্ষর যুক্ত হলো। জানা গেল ওই আইনে ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান নামে দুটি ডোমিনিয়ন তৈরি হয়েছে— যার প্রশাসক হিসেবে গভর্নর জেনারেলকে নিযুক্ত করবে ব্রিটিশ সরকার। ভারতের গভর্নর জেনারেল হলেন ব্রিটিশ নিযুক্ত এক ব্রিটিশ— মাউন্টব্যাটেন। জেদি ও প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে মাউন্টব্যাটেনকে মানলেন না। তিনি নিজেই পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হলেন। ইংরেজরা ভালো করেই জানতো যে যুক্তি ও বুদ্ধির লড়াইয়ে জিন্নাকে কাবু করা যাবে না। ভয় দেখিয়েও তারা পারেনি। জিন্নাহ্ নিজের দাবিতে অনড় ছিলেন।

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের জনগণ যে সংবিধান রচনা করলেন— তার প্রস্তাবনা অংশে যে আদর্শগুলি উল্লিখিত হয়েছে সেগুলি ভারতীয় সংস্কৃতির কথা। এগুলি সবই মানবিক ধর্ম ও মানবিক মূল্যবোধ ভিত্তিক এবং প্রাচীনকাল থেকে ভারতে অনুসৃত।

পরিতাপের বিষয় হলো— প্রস্তাবনা ও সংবিধানের ১নং ধারায় দেশটির নাম ইন্ডিয়া বলে উল্লিখিত হয়েছে। ভারতবর্ষ শব্দের ইংরেজি অনুবাদ ইন্ডিয়া নয়। আবার ইন্ডিয়া এবং ভারতবর্ষ সমার্থকও নয়। ইংরেজ শাসকরা ভারতকে 'ইন্ডিয়া' বলত। ১৯৪৭-এর আইনেও ইন্ডিয়া কথাটি আছে। আমাদের সংবিধানের ১নং ধারায় লেখা হলো— India, that is Bharat— একথা লেখা হলো না যে Bharat, that is India.

শব্দ দুটি অনুবাদ সূত্রে বা অন্য কোনও সূত্রেও সমার্থক নয়। 'ইন্ডিয়া' শব্দের দ্যোতনা আর 'ভারতবর্ষ' শব্দের দ্যোতনা এক নয়। দুটি পৃথক মানসিকতার দ্যোতনা। ভারতীয় নেতারা ঔপনিবেশিক ভাবধারায় এতই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে দেশের নামটাই বিদেশি করেছিলেন। বিশ্বে মাত্র দুটি দেশেরই দুটি নাম— ভারতবর্ষ এবং মিশর— একটি ইন্ডিয়া একটি ঈজিপ্ট। কোনও যুক্তিতেই ভারতবর্ষের নাম ইন্ডিয়া হতে পারে না। কিন্তু আমরা আজও ইংরেজ প্রভাব মুক্ত নই। ক্যালকাটা, বোম্বাই, মাদ্রাজ— যথাক্রমে কলকাতা, মুম্বাই ও চেন্নাই হতে পারে— ইন্ডিয়া কেন ভারত বা ভারতবর্ষ হতে পারে না? না হওয়াটা ভারতের সংস্কৃতি বিরোধী। ■

সংবিধানে সংরক্ষিত মত প্রকাশের স্বাধীনতা অবাধ নয়

বিমলশংকর নন্দ

স্বাধীনতাকে গণতন্ত্রের ভিত্তি বলেই মনে করেন সমস্ত সচেতন মানুষ। এখনকার উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ঐতিহ্যে স্বাধীনতার অধিকারটি ব্যক্তির জন্মগত অধিকারের মতোই। যতদিন যাচ্ছে স্বাধীনতা সম্পর্কে মানুষের চেতনা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণভাবে এটা মনে করা হয় যে স্বাধীনতার অধিকার ছাড়া ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। আবার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ না ঘটলে মানুষ একজন চেতনাসম্পন্ন রাজনৈতিক সত্তা এবং সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে না। আর সুনাগরিকই হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাফল্যের প্রধান শর্ত। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার অধিকার হলো একটি অন্যতম প্রধান মৌলিক অধিকার।

আবার স্বাধীনতার অধিকারগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাক ও মতামত প্রকাশের অধিকার। আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে ১৬৪৪ সালে ব্রিটিশ কবি এবং চিন্তাবিদ জন মিল্টন তাঁর পুস্তিকা 'এরোপ্যাগিটিকা'তে সংবাদ মাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের যে কোনো প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছিলেন। ১৬৪৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রেসের উপর নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়ম আরোপ করে। মিল্টন এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। এরপর ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি। ১৭৮৭ সালে একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লব গোটা পৃথিবীতে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে আরো মজবুত করে। ধীরে ধীরে গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক আদর্শের পাশাপাশি সামাজিক আদর্শ হিসেবেও পরিগণিত হতে থাকে। সমাজে একজন স্বাধীন মানুষের থাকে মতামত প্রকাশের অধিকার, সমালোচনা করার অধিকার। এইভাবে গণতন্ত্র একটি সামাজিক আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এতে গণতন্ত্রের পরিসর বাড়ে। গণতন্ত্র একটি আদর্শ এবং জীবনযাপনের একটি পদ্ধতি হিসেবে অর্থবহ হয়ে ওঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধান মানুষের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার হিসেবে বাক ও মতামত প্রকাশের অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছে। একবিংশ শতকে যোগাযোগ মাধ্যমের এই বিপ্লবের যুগে এই অধিকার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং কখনো কখনো হয়তো বিতর্কিতও।

ভারতীয় সংবিধান রচনার দায়িত্ব যে সংস্থার হাতে অর্পিত হয়েছিল সেই গণপরিষদের সদস্যগণ ব্যক্তিস্বাধীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই ভারতবর্ষের নাগরিকদের জন্য স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণের সাধু সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। এই সংকল্পকে কার্যকর করার জন্য সংবিধানের ১৯ থেকে ২২ ধারার মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯ ধারায় সংরক্ষিত স্বাধীনতার অধিকারগুলির অন্যতম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাক ও মতামত প্রকাশের অধিকার।

এই অধিকার বলে ভারতের সকল নাগরিক স্বাধীনভাবে নিজের চিন্তাভাবনা ও মতামত প্রকাশ করতে পারে। মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে তা করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে মার্কিন নাগরিকদের পৃথকভাবে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে আলাদাভাবে এই স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হয়নি। ভারতের সংবিধান রচয়িতাগণ মনে করেছিলেন যে পৃথক ভাবে এই অধিকারের উল্লেখের প্রয়োজন নেই। মতামত প্রকাশের অধিকারের মধ্যেই মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিহিত আছে। গণপরিষদে ড. বি.আর. আম্বেদকর এ বিষয়ে বলেছিলেন যে, সংবাদপত্রের সম্পাদক কিংবা ম্যানেজার ভারতের নাগরিক। ভারতের নাগরিক হিসেবে তিনি কিংবা তাঁরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁদের মতামত প্রকাশ করতে পারেন। তাই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। ভারতের সুপ্রিম কোর্টও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ১৯৫০ সালে রমেশ থাপ্পার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলার রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি এম পতঞ্জলি শাস্ত্রী মন্তব্য করেন, বাক্‌স্বাধীনতা এবং মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগঠনের ভিত্তি কারণ রাজনৈতিক আলাপ- আলোচনা ব্যতীত জনশিক্ষা সম্ভব নয়— বিশেষ করে যে জনশিক্ষা জনপ্রিয় সরকারের সঠিক কার্যনির্বাহের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।'

তবে ১৯ নম্বর ধারাটি দুটি ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে অর্থাৎ ১৯ (১) অংশে অধিকারগুলির উল্লেখ আছে এবং অপরভাগে অর্থাৎ ১৯ (২-৬) অংশে সেই অধিকারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতগুলি বিধিনিষেধের উল্লেখ আছে। জাতীয় স্বার্থ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের হাতে কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে

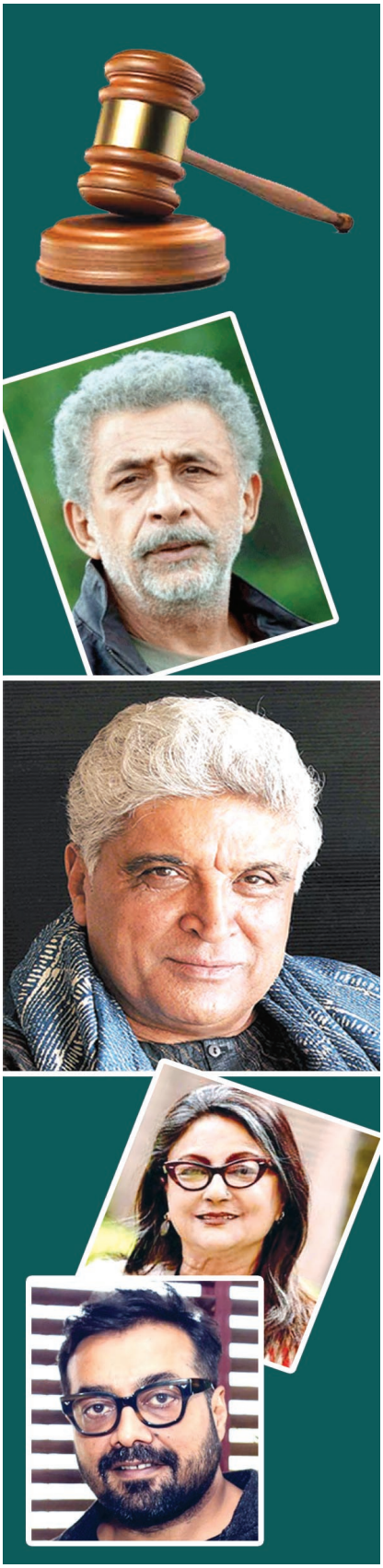

ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কারণ ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত স্বাধীনতার অধিকারগুলি অবাধ নয়। কোনো অধিকারই অবাধে ভোগ করা যায় না। কারণ অবাধ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার ডেকে আনে। এ.কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলার (১৯৫০) রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মতপ্রকাশ করেন যে, কোনো স্বাধীনতাই অবাধ ও নিরঙ্কুশ হতে পারে না। কারণ তা হলে বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা দেখা দেবে। সমাজজীবনে নৈরাজ্য ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে। এই অবস্থায় সকলের পক্ষে স্বাধীনতাভোগ সম্ভব হবে না। রাষ্ট্র তাই আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতার অধিকারগুলির উপর যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে।

সংবিধানের ১৯ (২) ধারায় বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর কিছু বিধিনিষেধের উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্র নিম্নোক্ত কারণে বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। এগুলি হলো :

(ক) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, (খ) বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা, (গ) জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, (ঘ) শিষ্টতা বা নৈতিকতা রক্ষা, (ঙ) আদালতের অবমাননা প্রতিরোধ, (চ) মানহানি প্রতিরোধ, (ছ) ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই নিষেধবিধির কথা মূল সংবিধানে ছিল না। রমেশ থাপ্পার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় (১৯৫০) সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫১ সালে সংবিধানের প্রথম সংশোধনের মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা রক্ষা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা এবং অপরাধ দমন প্রভৃতি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে আসে। তারপর ১৯৬৩ সালে ষোড়শ সবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতির স্বার্থে রাষ্ট্রকে বাধানিষেধ আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

তবে সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় উল্লিখিত স্বাধীনতার অধিকারগুলি যেমন অবাধ নয় তেমনি অধিকারগুলির উপর আরোপিত বাধানিষেধগুলিও অবাধ, অনিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। সংবিধান অনুযায়ী বিধিনিষেধগুলিকে যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অপব্যবহারের আশঙ্কার বিরুদ্ধে এটাই হলো একমাত্র রক্ষাকবচ। আর বিধিনিষেধ যুক্তিসঙ্গত কিনা তা নির্ধারণের ক্ষমতা ভারতের সংবিধান কর্তৃক শাসন বিভাগ বা আইন বিভাগের হাতে দেওয়া হয়নি। এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতের হাতে। কোনো আইনের দ্বারা আরোপিত বিধিনিষেধ নয় যুক্তিসঙ্গত নয় বলে মনে করলে আদালত সেই আইন বা তার অংশবিশেষকে বাতিল করে দিতে পারে। অসাংবিধানিক মনে হলেও এই বিধিনিষেধ বাতিল করতে পারে আদালত। এ.কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় (১৯৫০) যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের সমর্থনে বিচারপতি সুধীররঞ্জন দাস মন্তব্য করেছিলেন যে যদি কোনো আইন বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থ নিশ্চিত ও সংরক্ষণ করে তাহলে তা কিছু ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব করলেও তাকে উপযোগী বলে ধরে নিতে হবে। তবে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ কাকে বলে ভারতীয় সংবিধানে তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। তাই আদালত বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। চিন্তামন রাও বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য মামলায় (১৯৫২) সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেন যে বিধিনিষেধগুলি স্বেচ্ছাচারমূলক এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত হবে না। ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সামাজিক স্বার্থের মধ্যে যদি যথাযথ সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয় তবেই বিধিনিষেধকে যুক্তিসঙ্গত বলা যাবে।

একটি গণতান্ত্রিক সমাজে বাস করতে গেলে স্বাধীনতাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবেই দেখতে হয়। আবার অপরিমিত ব্যক্তিস্বাধীনতা যৌথ জীবন এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে, আর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব যদি ক্ষুণ্ণ হয় তবে তা সমস্ত মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনবে। গণমাধ্যম বিশেষত সামাজিক গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের এই যুগে এই বিষয়টি নিয়ে সবাইকে ভাবতে হচ্ছে। সন্ত্রসবাদ এখন কোনো একটি দেশে সীমাবদ্ধ নেই। ফলে সরকারকেও নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মাওবাদী কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিগোষ্ঠীর আক্রমণে নিরীহ মানুষ কিংবা নিরাপত্তা কর্মী নিহত হলে সরকারকে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে ব্যবস্থা নিতেই হয়। বাকস্বাধীনতার নামে সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গিবাদকে সমর্থন করা শুরু হলে সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সুস্থ পরিবেশ ক্রমেই বিপদগ্রস্ত হবে। মুক্ত সমাজ অবশ্যই কাম্য। কিন্তু নিরাপত্তাহীন, বিপজ্জনক ও বিশৃঙ্খল সমাজ কোনোভাবেই কাম্য নয়। ■

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির

প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

কৌশিক রায়

‘পঞ্চনদের তীরে—
বেণী পাকাইয়া শিরে,
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠিলো শিখ
নির্মম নির্ভীক।’
(বন্দীবীর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

দেশপ্রেম, মানবহিতৈষণা, আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার নিরিখে ভারতবর্ষে বাঙ্গালি, মহারাষ্ট্রীয় এবং রাজপুতদের পাশাপাশি পঞ্জাবের শিখদেরও অবশ্যই চিরশ্রদ্ধার আসনে বসানো যায়। গুরুগোবিন্দ সিংহের দ্বারা প্রবর্তিত, সামরিক শৌর্যনির্দেশক ‘খালসা’ প্রথাকে মেনে নিয়ে ‘শিখ’ বা ‘শিষ্য’দের ধারণ করতে হয় পাঁচটি ‘ক’—কেশ, কৃপাণ (ছোট তরবারি), কচ্ছ, কঙ্গা (লৌহ চিরুনি) ও কড়া (লোহার বালা)। তবে, শুধু শিখ সম্প্রদায়ই নয়, ভারতীয় ধর্মীয় ও স্থাপত্যচেতনার মনোমন্দিরে যে উপাসনালয়টি চির শ্রদ্ধাস্পদ আসন লাভ করেছে, সেটি হলো পঞ্জাবের অমৃতসরের হেমকান্তি, সুউন্নত স্বর্ণমন্দির বা হরমন্দির সাহিব। গুরু নানক প্রবর্তিত শিখ ধর্ম এবং পবিত্র ‘আদিগ্রন্থ’ বা ‘গুরু গ্রন্থসাহিব’-এর পাশে ভক্তি, অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেম, স্থাপত্যসৌকর্য্য এবং পরমাত্মার কাছে নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদনের সুরভিকে আবহমানকাল ধরে বহন করে চলেছে এই অমৃতসর স্বর্ণমন্দির বা হরমন্দির সাহিব।

বহুমূল্য সোনার পাতে আবৃত হলেও অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির তৈরি করা হয়েছে পোড়ামাটির ইঁট দিয়ে। উপাসনালয়টির ‘হরমন্দির সাহিব’ বা ‘ঈশ্বরদেউল’ নামকরণ করেন গুরু অর্জন দেব। জানা যায়— অমৃতসরে এক খণ্ড জমি, এক অনুরাগীর কাছ থেকে পান তিনি। তিনি তখন শিখদের চতুর্থ গুরু— রামদাসজীকে আদেশ করেন— ওই স্থানে

সাধারণ, খরাপীড়িত ও তৃষ্ণার্ত মানুষদের জন্য একটি সরোবর বা বড়ো পুকুর তৈরি করতে। মোগলবাদশাহ আকবরের রাজত্বকালেই ১৫৭০ সাল নাগাদ ওই সরোবর তৈরি করা শুরু হয়। ১৫৭৭ সালে ইঁটের প্রাচীর-সহ ওই সরোবর খননের কাজ সমাপ্ত হয়। এই কাজে সাহায্য করেন গুরু অর্জন দেব। অনন্ত জীবনের প্রতীক রূপে তিনি ওই সরোবরের নাম দেন— 'অমৃতসর'। এই সরোবরের নাম থেকেই অমৃতসর শহরের নামকরণ হয়েছে। এই সরোবরের মধ্যস্থলেই স্থাপত্য সুষমামণ্ডিত একটি বৃহদাকার উপাসনালয় স্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন গুরু অর্জন দেব। ঐতিহাসিক সূত্র, বিশেষ করে প্রখ্যাত ইংরেজ পুরাতাত্ত্বিক আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহ্যম রচিত 'The History of Sikhs' গ্রন্থটি থেকে জানা যায়— সাম্প্রদায়িক বিভেদকে দূর করে লাহোরের সুফি সাধক হজরত মিঞামির বা বাবা সাঁইমির হোহাম্মদ সাহিব-কে দিয়ে ১৫৮৮ সালে স্বর্ণমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন গুরু অর্জন দেব। ফার্সি ইতিহাসবিদ বুটে শাহ্ (গোলাম মহিউদ্দিন)-এর প্রামাণ্য গ্রন্থ— 'আওয়রিখ-ই- পঞ্জাব'-এও হজরত মিঞা মির-এর দ্বারা অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের কথা আছে। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ইয়ান কের জানিয়েছিলেন— মিশ্র স্থাপত্যরীতিতে তৈরি এই হরমন্দির সাহিবের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় ১৬০১ সাল নাগাদ। সরোবরের মধ্যস্থলে নির্মিত হলেও বাস্তুকারদের দক্ষতা ও নির্মাণ প্রকৌশলের জন্য হরমন্দির সাহিবের ভিতরে কোনওদিন কোনও আর্দ্রতার ভাব দেখা যায় না। উপাসনাগৃহটির চারটি প্রবেশদ্বার যেন সর্বধর্মের পুণ্যার্থীদের সমবেত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। স্বর্ণমন্দিরের ভিত্তি এবং কেন্দ্রস্থলটি কিছুটা কম উচ্চতার। এর অর্থ পরম করুণাময়ের কাছে পুণ্যার্থীদের নতমস্তকে আগমনের জন্য আহ্বান করা। অনেক দর্শনার্থীই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন স্বর্ণমন্দির নির্মাণকার্যে কায়িক শ্রমদান করতে। মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিষ্ঠুরতার বলি হন গুরু অর্জন দেব। এতে ইন্ধন দিয়েছিলেন গুরুজীর বিশ্বাসঘাতক, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রীতি চান্দ। জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র— খসরুকে আশ্রয়দানের মিথ্যা অজুহাতে অমৃতসর থেকে লাহোরের মোগল সেনাপ্রধান মুর্তাজা খান গুরু অর্জন দেবকে গ্রেপ্তার করেন। মুসলিম 'ইয়াসা' শাস্তিপদ্ধতি অনুযায়ী, গুরু অর্জনদেবের শরীর থেকে রক্তপাত ঘটানো হয়নি বটে, তবে, প্রবল গ্রীষ্মকালে তাঁকে উত্তপ্ত চাটুর ওপর বসিয়ে এবং ফুটন্ত জলে স্নান করতে বাধ্য করিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। গুরু হরগোবিন্দকেও অন্যায়ভাবে গোয়ালিয়োর দুর্গে মোগলরা তিনবছর আটকে রাখে। শেষপর্যন্ত মিঞা মির আর পঞ্জাবের তদানীন্তন রাজ্যপাল ওয়াজির খানের উদ্যোগে মুক্তি পান হরগোবিন্দ। স্বর্ণমন্দিরে তাঁর পুনরাগমনকে শিখ সমাজে 'বন্দি ছোড় দিবস' রূপে পালন করা হয়।

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের পূর্বসূরী হিসেবে পাকিস্তানের মোজাঙ্গ গুরুদ্বারার নাম করা যেতে পারে। এই গুরুদ্বারের স্থাপনের পিছনে একটি দীর্ঘ কাহিনি বিরাজমান। মোজাঙ্গের মোগল প্রতিনিধি— কাজি রুস্তম খাঁ, লাহোরে কমলা নামের একটি কিশোরীকে অপহরণ করে তাকে ক্রীতদাসীতে পরিণত করে। তাকে জোর করে ইসলাম ধর্মান্তরিত করে উচ্চশিক্ষার জন্য মিঞা মিরের কাছে পাঠানো হয়। মিঞা মিরের সহৃদয়তায় কমলা বেশ কিছু 'গ্রন্থসাহিব' স্তোত্র বা গুরুবাণী মুখস্থ করেন। গুরু হরগোবিন্দের সেবাধর্মের প্রশংসার জন্য কমলা (গুরুমুখী ভাষাতে 'কৌলান')-র প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয় কাজি রুস্তম। গুরু হরগোবিন্দের কাছে পালিয়ে গিয়ে অমৃতসরে আশ্রয় নেন কৌলান। সেখানে তাঁর জন্য একটি পৃথক আশ্রম তৈরি করা হয়। 'মাতা কৌলান'-এর নামযশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গুরু হরগোবিন্দ, মাতা কৌলান-এর নামে 'কাওয়ালসার' নামে একটি সরোবর, ১৬২৭ সালে নির্মাণ করেন। ১৬৩০ সালে মাতা কৌলানের মহাপ্রয়াণ হয়। লাহোরে যেখানে তাঁর বন্দিশালা ছিল, সেখানেই মোজাঙ্গ গুরুদ্বারা নির্মিত হয়।

অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের গর্ভগৃহটি চতুষ্কোণ এবং শ্বেতপাথরের পাটাতনযুক্ত। সরোবরটি প্রায় ৫.১ মিটার গভীর। গর্ভগৃহে প্রবেশ করার অলিন্দ এবং প্রবেশদ্বারটিকে 'দর্শনী দেওড়ি' নামে অভিহিত। সরোবরের জলে স্নানকে দর্শনার্থীরা তাঁদের ইহজন্মের কর্মের পুণ্যফল বলে মনে করেন। গর্ভগৃহের নীচের মেঝেতে দিনে ২০ ঘণ্টা 'গুরু গ্রন্থ সাহিব'টি রাখা থাকে, ভজন ও চামর ব্যজন করা হয়। ৪ ঘণ্টা গ্রন্থটি শয়নকক্ষে থাকে। গর্ভগৃহটির বহিরঙ্গটি সোনার জলে মোড়া তামার পাত দ্বারা আবৃত। স্বর্ণমন্দিরের দেওয়ালে কিন্তু আরবী ধাঁচের গুরুমুখী অক্ষরে আদিগ্রন্থের স্তোত্র এবং বিভিন্ন গুরুবাণী খোদাই করা আছে। এছাড়া আছে শিখ গুরুদের প্রতিকৃতিযুক্ত দেওয়াল চিত্র বা 'মুরাল'।

খালিস্তান উগ্রপন্থী বাহিনী ও তার প্রধান জার্নেইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালাকে অমৃতসর স্বর্ণমন্দির থেকে উৎখাত করার জন্য 'অপারেশন ব্লু স্টার' নামক যে সামরিক অভিযান চালানোর নির্দেশ তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী-ইন্দিরা গান্ধী দিয়েছিলেন সেটা যুক্তিযুক্ত ছিল না। হুলিও ফের্নান্দো রিবেইরো নামক, খ্রিস্টানধর্মী, পঞ্জাব পুলিশের তদানীন্তন বড়োকর্তার অধীনে পরিচালিত এই নারকীয়, বর্বরোচিত অভিযান শিখরা মেনে নিতে পারেননি। অনেক উচ্চপদস্থ শিখই দেশে-বিদেশে হরমন্দির সাহিবকে অস্ত্র দ্বারা কলুষিত করার অভিযোগে চাকরি ত্যাগ করেন। □

তুলসীমঞ্চ ছাড়া হিন্দু বাঙালির গৃহস্থালী অসম্পূর্ণ

চূড়ামণি হাটি

শঙ্খচূড় দৈত্য। কিন্তু দৈত্য বিনাশ প্রয়োজন। এদিকে ব্রহ্মার বরে স্ত্রীর সতীত্ব গুণে শঙ্খচূড় অমর। নারায়ণ ছল করে শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশ নিয়ে শঙ্খচূড়ের স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করেন। এর ফলে শিবের ত্রিশূলে শঙ্খচূড় বধ সম্ভব হলো। এক খণ্ড মাংস লেগে থাকা ত্রিশূল শিব সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। শিবের ইচ্ছেয় সেই মাংস টুকরোই শঙ্খ ও হিন্দু রমণীর সতীত্বের অংশ হলো। এদিকে লজ্জা ঘৃণায় শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলসীগাছের রূপ নিল। বলাবাহুল্য রাম ও কৃষ্ণ কাহিনির সাথে জড়িয়ে আছে আরও দুটি কাহিনি। একটিতে রামচন্দ্র তুলসীগাছকে প্রশ্ন করেছিলেন পিতা দশরথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের নিয়ম সীতা পালন করেছিলেন কী-না। তুলসী মিথ্যা বলে। যার ফলে সীতার অভিশাপে তুলসী পেল ক্ষুদ্র দশা। আর একটি মতে তুলসী নামে কৃষ্ণের এক অন্যতম গোপিনী ছিলেন। রাধার অভিশাপে তুলসী গাছের রূপ পেল। যেন এসব খণ্ড সত্য, খণ্ড কল্পনা। লৌকিক রূপ থেকে আধ্যাত্মিক রূপের দিকে যাত্রা। আধ্যাত্মিক ভাবনায় তুলসীগাছ মঞ্চ পেল। লৌকিক বিশ্বাস এই তুলসীতলায় বিষ্ণু ত্রি-সন্ধ্যা অর্থে সর্বদা বিরাজ করেন। স্থায়ী বিষ্ণু বা হরি মন্দির। চাকে ও 'শিড়া'-পদ্ধতির সাহায্যে তৈরি পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ।

নদীয়ার নবদ্বীপের চৈতন্যদেব এবং বীরভূমের একচক্রা গ্রামের নিত্যানন্দের নব্য বৈষ্ণব ধর্মীয় দর্শনে তুলসীমঞ্চ গুরুত্ব পেয়েছিল। যদিও বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে তুলসী প্রসঙ্গ আছে। দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগে রচিত জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের প্রেম ভক্তিরস মাধুর্য নিয়ে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু তুলসী মঞ্চ চর্চাটি গুরুত্ব পেল মন্দির শিল্পকে কেন্দ্র করে। স্থায়ী ভাবে এ মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু সমাজের বাস্তু ভূমিতে। বাড়ির মেয়েরা স্থানটিতে নিত্য সেবা বা পুজো দেন। পবিত্র ভূমি। প্রতি পূর্ণিমায় বিশেষ পুজো। আবার মন্দির, নাটমঞ্চ, স্নান-ঘাট যেমন একে অপরের সম্বন্ধ যুক্ত; তেমনি রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সঙ্গে তুলসীমঞ্চের সম্বন্ধ। তুলসীমঞ্চ আসলে একটি ছোট্ট মন্দির। বাংলার পথে ঘাটের পরিচিত লৌকিক দেবদেবীদের থেকে আলাদা। ছবি-আলপনায় সাজানো। জড়িয়ে আছে লোকাচার-বিশ্বাস-সংস্কার এবং সৌন্দর্যচেতনা ও প্রেম-আনন্দ। যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি জনসংযোগের অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে ভক্ত মনকে আকৃষ্ট করে। অথচ ঘরোয়া। বলাবাহুল্য বৃক্ষ পুজোর রীতিটি যথেষ্ট প্রাচীন। আদিতে মানুষ ছিল সর্বপ্রাণবাদী; প্রকৃতির উপাসক। তারা বিশ্বাস করতো প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আত্মা আছে। বৃক্ষ পুজো, বিমূর্ত প্রতীক, আবার কখনো পশুই দেবতা; সর্বশেষ স্তরে এসেছে নরাকার দেবভাবনা। মানুষ তার নিজের মতো করে দেবতাকে ভেবেছে। হিন্দু সমাজে তুলসীমঞ্চে জল দেওয়া থেকে তুলসীপাতা তোলা সবই মন্ত্রনির্ভর। তুলসীপাতা ও মঞ্জরীর ঔষধী গুরুত্বও কিন্তু কম নয়। পরিবেশ বিজ্ঞানে তুলসীগাছ যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। তুলসীগাছের কয়েকটি শ্রেণী ভাগ আছে। সবুজ বড় পাতা বিশিষ্ট স্ত্রীতুলসী, গাঢ় সবুজ-বেগুনি পাতা বিশিষ্ট কৃষ্ণ তুলসী, তীব্র গন্ধযুক্ত বন তুলসী বা রামতুলসী, লবঙ্গের মতো গন্ধের ভুঁই বা বাবুই তুলসী, লম্বাটে পাতার সুগন্ধী তুলসী, কর্পূর তৈরিতে ব্যবহৃত কর্পূর তুলসী। যাই হোক, তুলসীগাছকে দেবীজ্ঞানে স্থান দেওয়ার অর্থ সৌখিন মানসিকতায় লৌকিক ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতার দৃষ্টান্ত স্থাপন। লোকসমাজের বিশ্বাস যার গৃহে তুলসীবন আছে, তার গৃহ তীর্থস্বরূপ; যারা বৈশাখ মাসে তুলসীগাছ লাগান তারা অশ্বমেধের ফললাভ করেন; যারা বিষ্ণু ও তুলসীর সেবা করে থাকেন তাদের ভোগ বাসনা পূর্ণ হয়। তাই তুলসীতলায় গোবর জলে লাতা দেওয়া, প্রণাম, পুজো, সন্ধ্যা দেওয়ার মতো রীতি পালন করা হয়।

ব্রত এবং অনেক পুজোর আয়োজন প্রস্তুতিতে তুলসীতলাকেই বেছে নেওয়া হয়। তুলসীমঞ্চকে কেন্দ্রে রেখে কীর্তন গান সাধারণ ঘটনা। শ্রীহরির পুজোর প্রধান উপকরণ তুলসীপাতা। চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সময় তুলসীপাতার ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রসাদ বা চরণামৃতের সঙ্গে তুলসীপাতা, সাধু সেবায় তুলসীপাতার ব্যবহার, হিন্দুধর্মে মৃতের চোখে তুলসীপাতা দেওয়ার রীতির মতো নানা প্রয়োজনে ব্যবহার। লৌকিক সংস্কারগত ধর্মীয় গুরুত্বই তুলসীগাছকে মঞ্চ দিয়েছে। ভূমি থেকে একটু উঁচুতে। ধীরে ধীরে উঁচু ঢিবি মন্দিরের রূপ নিয়েছে। যেহেতু গাছ তাই খোলা মন্দির। অধ্যাত্মবোধ ও শিল্পবোধের সমন্বয়। দশম-একাদশ শতকে বরাকরের শিল্পীদের তৈরি বেগুন আকৃতির বেগুনিয়া মন্দির এবং বিষ্ণুপুরে মল্লরাজাদের আমলে তৈরি চালাঘর ও জোড় বাংলো মন্দির চর্চার পাশাপাশি; ওড়িশার মন্দির- স্থাপত্য চর্চা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর-সোনামুখী, মেদিনীপুরের দাসপুর, হুগলীর গুপ্তিপাড়ার সূত্রধরদের মন্দির চর্চাকে প্রভাবিত করেছিল। ধ্রুপদী শিল্প চর্চা; কিন্তু না ধ্রুপদী না লৌকিক। বাংলার মন্দির শিল্পচর্চা আসলে উৎকর্ষের ঝোঁক। রেখ বা শিখর দেউল, ভদ্র বা পীড়া দেউল, শিখর যুক্ত ভদ্র দেউল বা খাখরা দেউল, স্তূপ যুক্ত ভদ্র

দেউল বা গৌড়ীয় দেউল। এই চারটিই ধ্রুপদী নিদর্শন। কয়েকটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া বাংলার মন্দির মূলত তিন ধরনের। প্রথম ধরনটি হলো বাংলার নিজস্ব পদ্ধতি। কুঁড়ে ঘরের আদল। দো-চালা। চার-চালা। দ্বিতল ঘরের অনুকরণে চার চালার উপর অলঙ্কৃত চারচালা নিয়ে আটচালা। দুটি দো চালার সংযোগে জোড় বাংলা। দ্বিতীয় ধরনটি হলো চালাঘরের মতো ঢালু ও বাঁকানো কার্নিস যুক্ত ছাদ আর এক বা একাধিক চূড়া সংবলিত রত্ন মন্দির; মূল গর্ভগৃহে একটি কুঠরী বানিয়ে সর্বচ্চ চূড়া। মধ্য চূড়া। মধ্যে একটি এবং চার কোণে চারটি চূড়া নিয়ে পঞ্চরত্ন। প্রয়োজনে মধ্য চূড়ার উপর আবার এক বা একাধিক তল তৈরি হয়। মূল গর্ভ গৃহেই দেবতার অধিষ্ঠান! আর মন্দির তলের সংখ্যা বাড়ালেই চূড়া বা রত্ন সংখ্যা বেড়ে যায়। চূড়াগুলি অলঙ্কৃত ছোট্ট-ছোট্ট গৃহ। তৃতীয় ধরনটি হলো সামনে খিলান যুক্ত বারান্দা-সহ সমতল ছাদ নিয়ে দালান মন্দির। বলাবাহুল্য এক সময় মন্দির বলে কিছুই ছিল না। যজ্ঞস্থান আর পথে ঘাটে পড়ে থাকা কোনও অলৌকিকতাকে আশ্রয় করে লৌকিক সমাজ ভিড় জমাতো। যাই হোক, বাংলার পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ কুম্ভকারদের তৈরি। বাংলার মন্দির শিল্পের ক্ষুদ্র রূপ। চালা মন্দির ও পঞ্চরত্ন মন্দিরের অপূর্ব মিশ্রণ। মাটির, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা ভঙ্গিতে নানা রূপে ইট-সিমেন্ট ও পাথরের হয়েছে। সেঁটে দেওয়া হচ্ছে এনামেল প্লেটে চিত্রিত রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি। কিংবা তেল রঙে আঁকা। মাটির তুলসীমঞ্চের সন্ধান মিলবে মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া, তমলুক, সুতাহাটা, দাসপুর, খড়্গপুর, সনাবাজার, মির্জাবাজার এবং বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে।

পাঁচ ভাগ এঁটেল মাটির সঙ্গে এক ভাগ বালি মাটির মিশ্রণ একদিন ছায়ায় রেখে; সেটি দিয়ে দড়ির মতো লম্বাটে 'শিড়া' বানানো হয়। শিড়াগুলি কাঠের তক্তায় পর পর রেখে জুড়ে দেওয়া হয়। তারপর কাঠ দিয়ে পিটিয়ে তৈরি হয় হাফ থেকে এক ইঞ্চি পুরু সমতল দেওয়াল। দেওয়ালের সংখ্যা অনুসারে চার-ছয়-আট কোণা স্তূপ। উচ্চতায় পঁয়তাল্লিশ থেকে নব্বই সেন্টিমিটার। দুটি দেওয়ালের মধ্যবর্তী সংযোগ স্থলটি লম্বা কাদার পটি দিয়ে জোড়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ তৈরি মঞ্চটির ভেতরটি ফাঁপা। নীচের সমতল ভূমির সঙ্গে সংযোগ রেখে মাটি ভরাট সম্ভব। চতুর্ভুজ কিংবা ষড়ভুজ কিংবা অষ্টভুজ মঞ্চটির প্রান্ত ভাগ এবং তার একটু উপরের চারপাশ কাদার পটি দিয়ে বেড়ি দেওয়া হয়; যাতে অল্প মাটির গভীরে থাকা মঞ্চটি সহজে উপড়ে তোলা না যায়। ঊর্ধ্বভাগের চালাটি ঢালু এবং বাংলার চালার মতো বাঁকানো। যার ভেতরটিতে থাকে একটি কাণা উঁচু অর্ধ কলস। কিংবা পরপর দুটি ছোটো অর্ধকলস। তৈরি হয় চাকের সাহায্যে। কাদার সাহায্য নিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়। তারপর দক্ষতার সঙ্গে উপরের চালাটি তৈরি করা হয়। উপরের কানা উঁচু কলসটিতেই তুলসীদেবীর অবস্থান। পরপর দুটি অর্ধকলস কাঠামো থাকলে; সংযোগ স্থলের বেড়িতে সেঁটে দেওয়া হয় বিষ্ণু বা কৃষ্ণের মুখ নিয়ে তিন-পাঁচটি সর্পফণা-ছত্রের ক্ষুদ্র রূপ এবং চক্র। চারপাশে পরপর সাজানো। তুলসীমঞ্চের দেওয়ালটিতে সেঁটে দেওয়া হয় অলঙ্কৃত মূর্তি পুতুল। ঠিক যেমন টেরাকোটার মন্দিরগুলি সাজানো হয় ছাঁচে তৈরি ফলক দিয়ে। নির্দিষ্ট প্যানেলে সাজানোর জন্য ফলকগুলির পেছনে থাকতো নির্দেশক চিহ্ন বা সংখ্যা। ক্ষুদ্র তুলসীমঞ্চগুলি কিন্তু সূত্রধরদের তৈরি এই ফলক দিয়ে সাজানো হয় না। কুম্ভকারদের তৈরি পুতুল। যেমন রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী- নারায়ণ, রাম-সীতা, আলঙ্কারিক ফুল-নকশা। পাশাপাশি লেখা থাকে শিল্পী ও গৃহকর্তার পরিচিতি, প্রণাম বাক্য, কৃষ্ণ নাম। মোটামুটি পয়ার ছন্দে লেখার চেষ্টা। অনেক সময় তুলসীমঞ্চের নীচের দিকে ছোটো একটি খোপ কাটা থাকে। মূল উদ্দেশ্য প্রদীপ শিখাকে হাওয়া থেকে একটু আড়াল করা। মুদ্রা উৎসর্গ কিংবা অন্য কোনও ঠাকুরের মাটি-চরণামৃত রাখার জন্যও ওই স্থানটি বেছে নেওয়া হয়। বলাবাহুল্য, তুলসীমঞ্চের গঠন এবং ওই খোপ অনেক বড় ও চারধার উন্মুক্ত রেখে; ওই গর্ভগৃহে তুলসীদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করার দৃষ্টান্তও লক্ষণীয়। সেক্ষেত্রে তুলসীমঞ্চটির উপরিভাগ মন্দিরের চেহারা নেয়। এ ধরনের তুলসীমঞ্চগুলি টেরাকোটা মন্দিরের সমগোত্রীয়।

বাংলায় প্রচলিত ছোটো ছোটো তুলসীমঞ্চগুলিও পোড়ামাটির। রোদে শুকিয়ে 'বণক'-এর প্রলেপ লাগিয়ে পণে পোড়ানো হয়। তারপর মাটিতে কিংবা চৌকো উঁচু বেদী প্রস্তুত করে তুলসীমঞ্চটিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মঞ্চের চারপাশটি আলপনা চিত্রিত। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখের সংক্রান্তি পর্যন্ত তুলসীমঞ্চের দু' পাশে বাঁশ বেঁধে দু-প্রান্তে দড়ি বেঁধে ছোট ছিদ্র যুক্ত একটি হাঁড়ি ঝোলানো হয়; যাতে ওই ছিদ্র পথে বেরিয়ে আসা বিন্দু-বিন্দু জল তুলসীগাছের উপর পড়ে। তুলসীগাছ সংরক্ষণে এ এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। ধর্মীয় মোড়কে প্রেমের প্রতীক বা তুলসীর ভেষজ বস্তুগুলিকে রক্ষা করা। নদীমাতৃক পলির দেশে পোড়ামাটির শিল্প বস্তু নির্মাণ করে তুলসীদেবীকে লৌকিক সমাজ একটা নির্দিষ্ট মঞ্চ দিল। বলাবাহুল্য, মাটিতে গর্ত করে তাকে পাত্র হিসাবে ব্যবহার কৌশল থেকেই মাটির পাত্রের ধারণা। তুলসীমঞ্চ নির্মাণ করেন এরকম শিল্পীদের কেউ কেউ নিজেদেরকে রাজমিস্ত্রিও বলেছেন। যাইহোক, প্রাচীন গ্রিসে রাজকীয় উৎসবেও তুলসী ব্যবহৃত হতো। মোন্ডাভিয়াতে বাউন্ডুলে প্রেমিকের জীবনকে বাঁধতে প্রেমিকা তার হাতে তুলে দেন সমঞ্জরী তুলসী। তুলসী অক্সিজেনের শক্তি ঘর। পুণ্যিপুকুর, কুলকুলতি, বসুন্ধরা ব্রতের সময় মেয়েরা এই শক্তিঘরকে নিরাপদ এবং পবিত্র স্থান হিসাবেই বেছে নিয়েছেন। কখনো কখনো মঞ্চটিকে ঘিরে তিন ধারে সেজে ওঠে ফুলের বাগান। গ্রাম্য পরিবেশে তুলসীমঞ্চের পাশাপাশি থাকে ধানের মোড়াই এবং বেশ দূরে হাঁস ঘর। আরও একটু দূরে গোয়ালঘর এবং খামার ও সারকুল। কিন্তু মাটির তুলসীমঞ্চ প্রায় হারিয়ে গেছে। যদিও তুলসীমঞ্চ এখনও আছে।■

প্রতিপদে নিরুদ্ধ
নটিনী বিনোদিনী

(বিনোদিনী দাসী বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। বস্তুত তিনি না থাকলে বাঙ্গালির বড়ো গর্বের স্টার থিয়েটারে গড়ে উঠত কি না, তাতে সন্দেহ থেকেই যায়। অথচ বিনোদিনী ইতিহাসে উপেক্ষিতা। স্বস্তিকায় তিন পর্বে প্রকাশিত হবে বিনোদিনীর জীবন ও অভিনয় নিয়ে একটি বিশেষ নিবন্ধ। এই সংখ্যায় প্রথম পর্ব। —স্ব. স)

শেখর সেনগুপ্ত

প্রথম পর্ব

হাতিবাগানে বছরে এক-আধবার তো যেতেই হয়। ভিড় থাকলেও তা বিপজ্জনক নয়। বাঁ-দিকে মোড় নিয়ে কয়েক পা হাঁটলেই স্টার থিয়েটার। বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ওর অতীতরূপকে নিয়ে ভাবি। সকাল সকাল গেলেও কিছু লোকজনের জটলা নজরে আসে। তাদের আচার ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায়, এরা সব সিনেমাখোর— নতুন কী ছবি এল, তা-ই দেখছে। 'স্টার'তো এখন আর থিয়েটার হল নয়, সিনেমা হল। পোস্টারে নায়িকার হাসিমুখ এবং কিছু উত্তেজনাপূর্ণ অমানবিকতার ছাপ থাকলেই দর্শকরা আকৃষ্ট। আমি কিন্তু বিনোদনের সেই নেমতন্ন খেতে আগ্রহী নই। আমার মনে তখন কিছুক্ষণের জন্য হলেও মুষলধারায় নেমে আসছেন নটিনী বিনোদিনী। বিনোদিনীর একটি মর্মরমূর্তি কি এই ভবনের প্রবেশদ্বারে স্থাপন করা যেত না? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একবার ভেবে দেখতে পারেন।

আসলে আমি বার দুয়েক পাঠ করেছি বিনোদিনীর আত্মচরিত 'আমার কথা'। নিকটজনদের অগোচরে আমার মনোগত ভাবনায় বেশ আলোড়ন তুলেছে ওই বই। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যস্ততার মধ্যে বিনোদিনীকে নিয়ে ভেবেছি এবং অনতিপরেই নিজেকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছি ১৫৯ বছর আগেকার এক বিশেষ মুহূর্তে, যখন ১৪৫ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট অর্থাৎ একালের বিধান সরণিতে তাঁর দিদিমার ঘরে জন্ম নিলেন বিনোদিনী। সেই সময়ে ওই এলাকার যারা স্থায়ী বাসিন্দা, তাদের প্রায় সকলেই বারাঙ্গনা। দিনের আলো নেভার আগেই বাবুদের মতিগতি, গতিবিধি বুঝতে তারা যার যার বাড়ির দাওয়ায় গিয়ে বসে অথবা বিশেষ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকে। বাঈজিদের গানে শিগ্‌গির খান খান হয়ে যাবে সামান্য নীরবতাও। শোনা যেতে পারে কাতরকণ্ঠের আবেদনও। এমত অসামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার পরও বিনোদিনী যে কোন আত্মশক্তির জোরে আড়ালে বসে সাহিত্যচর্চাতেও ডুবে যেতেন, তার হদিশ মেলা কঠিন। বেদনায় কিংবা মহা দুশ্চিন্তায় ছুটে পালাবার চেষ্টা করেননি কিশোরী কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে। চারদিকের ঘোরালো পরিস্থিতির মধ্যেও আস্তে আস্তে লিখে ফেললেন আত্মকথা— 'আমার কথা'। এত যুগ বাদে বিনোদিনীর সেই লেখা ধরেই এগিয়ে গেলাম তাঁর অভিনেত্রী জীবনের রূপরেখা অঙ্কনে।

বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবনের পরিধিটি কিন্তু দীর্ঘ নয়। মাত্র ১২ বছর। তার মধ্যেই ৮০টি নাটকে তাঁর অসাধারণ অভিনয়। সমকালীন চাপকান পরিহিত নাট্য পরিচালকদের বিচারেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'নাট্যসম্রাজ্ঞী'; সম্মুখে বহু দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ। কিন্তু নায়িকার উপার্জন অতি সামান্য এবং তিনি তড়িঘড়ি মঞ্চ ছেড়ে নাট্যশালার দালান ছেড়ে ঘরে ফিরতে ব্যাকুল। কেবল অভিনয় নয়, তাঁর সুরেলা কণ্ঠস্বরে গীত গানগুলিও সেই যুগের খ্যাত-অখ্যাত মানুষদের হৃদয় হরণ করল। তিনি যখন মঞ্চে উঠতেন, হু হু করে নিখোঁজ হয়ে যেত তাঁর ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনের কালিমা, মান-অপমান, হরেক কিসিমের ঝামেলা-ঝক্কি। বাইরে যতই গৌরব থাক, নরম আলোয় যতই তিনি তাঁর অভিনয় ও সংগীতের প্রসারতা দেখান না কেন, সেই ১২টি বছরে তিনি একদিনের জন্যও শনির দশা থেকে মুক্তি পাননি। বাড়িতে ঢুকলেই বাঈজীদের—

হারমোনিয়ামের রিডে রিডে কেবল মানসিক বেদনা এবং লালিত্যময় শরীরটার টানে উপস্থিত বাবুকে মনোযোগী করে তোলা। সর্বকর্ম মিটে যাবার পর স্মরণে আনতেন তাঁরই প্রতি উচ্চারিত শ্রীরামকৃষ্ণের সেই আশীর্বাদ, 'তোমার চৈতন্য হোক।'

চৈতন্য কোথায়? নিজস্ব চত্বরের মধ্যে আবদ্ধ বিনোদিনী তো খুঁজেই পাচ্ছেন না সেই মহৎ উদ্দেশ্যের ছিঁটেফোঁটা। অসম্ভব গরমবোধ। দরদর করে ঘামছেন। ঘটি তুলে গলা ভেজান ঘন ঘন।

বিনোদিনী প্রথম যেদিন নাটকের মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন, তখন তিনি ১১ বছরের বালিকা। সামনে চেয়ারে-বসা কয়েক শত দর্শককে দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তবুও নির্ভুল উচ্চারণে আর অঙ্গ-ভঙ্গীর হিল্লোলে দর্শকদের বাহবা কুড়ালেন। চারিদিকে বালিকার অভিনয়ের প্রশংসা। এক হেঁপো বুড়ো তাঁকে আবার বাড়ি পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। বিনোদিনী রাজি হননি। সেই ১১ বছর বয়সে মঞ্চে ওঠা। তারপর ওই মঞ্চেই দীর্ঘ একযুগ দাপটে অভিনয় করে যাবার পর ২৩ বছর বয়সে স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর তীব্র বচসা। এঁরা তাঁকে প্রাপ্য টাকা দেন না, হাতের গেলাস থেকে উত্তেজক পানীয় ছড়িয়ে সাজঘরকে স্যাঁসস্যাঁতে করে, নেশার ঘোরে বিনোদিনীকে আটকে রাখতে চান, মুখে অশ্রাব্য নোংরা কথা। অভিমানে, ঘৃণায় বিনোদিনী শপথ নিলেন, 'আমি আর এই স্টার থিয়েটারে ফিরে আসছি না।' অথচ সেই স্টার থিয়েটার একরকম তাঁরই অর্থে ও মেহনতে নির্মিত।

বাড়িতে যখন হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলেন, রাত্রি তখন নিশিথিনী। বিছানায় শুয়ে বিড় বিড় করেন, 'স্টেজে উঠে যতটুকু দেবার আমি দিয়েছি। আর নয়। আমি এখন কেবল লিখব। লিখেই যাব। আর যা...;

অভিনয় ভুবনে এসে প্রভূত সুখ্যাতি লাভের পরও বিনোদিনীকে যেভাবে মালিকদের কাছে বার বার হেনস্থা হতে হয়েছে, এ যুগে একজন অতি সাধারণ অভিনেত্রীর জীবন আতিপাতি করে খুঁজলেও তেমন কোনও নজির আপনার হাতের নাগালে আসবে না। অভিনয় ছেড়ে দিয়ে কলম ধরলেন মাত্র ২৩ বছরের জ্যোতির্ময়ী যুবতী। জীবনের বাকি দিনগুলিতে আরও

অনেক কিছুর সঙ্গে লেখাটা চালিয়ে গেলেন।

আজ আমি যখন একান্তে বসে বিনোদিনীর আত্মজীবনী 'আমার কথা'র পরিচিত পৃষ্ঠাগুলিতে আবার চোখ বোলাতে শুরু করি, যেন দেখতে পাই ওই পরিবেশ, যেখানে নিতান্ত বালিকা বিনোদিনীর দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে সুচনায়। বিনোদিনী লিখেছেন, '...সন্নিকটে যতগুলি নিবাস ছিল, আমাদের বাড়িটাও তাহাদের একটি। তবে আয়তনে একটু বড়ো। একটি ঘরের চালা ছিল খোলার। সেখানে ভাড়াটিয়া ছিল। তাহারা বিবাহিত না হইয়াও স্বামী-স্ত্রীর ন্যায়ই ঘর-সংসার করিত। দিন আনিত দিন খাইত এবং সময়ে সময়ে নিজেদের মধ্যে এমন মারামারি করিত যে দেখিলে মনে হইত, অতঃপর ইহাদের মধ্যে আর বাক্যালাপ ঘটিবে না। কিন্তু অচিরে দেখা যাইত, আহারাদি সারিয়া তাহারা রসালাপে নিমজ্জিত।'

বিনোদিনী লেখাপড়া শিখেছিলেন নিজের চেষ্টায় এবং আগ্রহে। হাতে বই এলেই খুশিতে গুন গুন করে গান গেয়ে উঠতেন। পড়তে পড়তে এমন মগ্ন যে পা দুটো ঠাণ্ডায় কন কন করলেও হুঁশ নেই। অথচ তিন-চার রশি দূরত্বে কোনও প্রতিবেশিনীর ঘরে হয়তো তখন খদ্দের ঢুকছে এবং খুব হুল্লোড় শুরু হয়ে গেছে। বাংলা লেখায় বিনোদিনীর দক্ষতা ছিল, সেই যুগের তুলনায় যা প্রকৃতই অসচরাচর। প্রকাশ্যে যা অনুচ্চারিত, সেই কথাগুলিকেই গুছিয়ে লিখতে পারতেন তিনি। প্রয়োজনে দিব্যি ইংরেজিতেও কথা কইতে পারতেন। হাস্যাস্পদ হতে হয়নি একবারও। এমনি ধারা ইংরেজি যেমন পড়তে পারতেন, তেমনি খানিকটা লিখতেও পারতেন। অর্থাৎ জীবনযাত্রা যেমনই হোক না কেন, তার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আগ্রহ। অথচ তাঁর জন্মপরিচয় নিতান্ত অগৌরবের। তাঁর নিরীহ মা কোনওদিন তাঁর মেয়েকে বলে যেতে পারেননি, কে তাঁর জনক। একাধিক পুরুষের সঙ্গে তাঁর নিত্য সংসর্গ। তাই কে যে বিনোদিনীর বাবা, তাঁর পক্ষে বলা অসম্ভব।

সংসার বলতে বালিকা বিনোদিনী বুঝতেন, বেতের ধামা হাতে দিদিমার ছোটাছুটি, সন্ধ্যা নামবার আগেই মায়ের লণ্ঠন ধরানো এবং ছোটো ভাইটার এমন দুরন্তপনা যেন সে একটা মহিষের কাঁধে উঠে বসতে চায়। সেই ভাইটির বয়স যখন সবে পাঁচবছর, তাকে বিয়ে দেওয়া হয় আড়াই বছরের এক শিশুকন্যার সঙ্গে। উদ্দেশ্য একটাই,— কয়েক শো টাকার যৌতুক আদায়। কীর্তিটা দিদিমার। কী দাপট সেই বুড়ির! কী বিশ্রী তাঁর কথাবার্তা! আবার কখনও খুব খারাপ কথা ছুঁড়ে দিয়ে মুচকি মুচকি হাসেন। যে নাতিকে বিয়ে দিয়ে কয়েক শো টাকা কোমরে গুঁজে ছিলেন, সেই নাতি কিন্তু বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। যেমন জ্বর, তেমনি বমি। কোবরেজ এলেন। কিন্তু তাঁর পাচনই যেন বেইমানি করল। নাতি মারা গেল। একটা বড়ো পুঁটলিতে দেহটাকে মুড়ে যখন নিমতলা শ্মশানের দিকে যাত্রার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, বিনোদিনীর মা তখন যথার্থই উন্মাদিনী। দেয়ালে কপাল ঠুকেই চলেছেন। গঙ্গাতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও তিনি করেছেন। দিদিমার কিন্তু শোকের প্রকাশ কম। কেবল ছোটো একটা খুরিতে ঘি ঢেলে কী সব মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে এ ঘর সে ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই সব ঘটনার বিবরণ আমরা পাই বিনোদিনীর লেখা 'আমার কথা'তে। তাঁর সরল ও সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ লেখা প্রলুব্ধ করে একাধিকবার পাঠ করতে। সেই লেখাতে সমকালীন বঙ্গীয় সমাজের ছবিও পেয়ে যাই।

মা ও দিদিমাকে মান্যতা দিতে বাধ্য ছিলেন বিনোদিনী, যদিও বহুক্ষেত্রে ওই দু'জনেরই বিবেচনাশক্তি ছিল খুব কম। তাঁরাই বিনোদিনীকে বিয়ে দিয়েছিলেন নিতান্ত বালিকাকালে। বিয়েটা নামমাত্র। যার সঙ্গে তাঁর ওই তথাকথিত বিবাহটি হয়েছিল, বিনোদিনী কোনও কালেই সেই লোকটির খোঁজ পাননি। দিদিমা দান-সামগ্রী সাজিয়ে সুন্দরী নাতনিকে বিয়ে দেওয়ার পাত্রীই নন।, নির্ঘাৎ কোনও আধবুড়ো এসে বসেছিল বিয়ের পিড়িতে। আর দিদিমাও হয়তো হেঁসো হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন লোকটার পিছনে।

১৯২০ সালে মুদ্রিত 'আমার অভিনেত্রী জীবন' গ্রন্থে বিনোদিনী কথ্য ভাষাতেই লিখেছেন, 'আমরা জাত বৈষ্ণব। চার-পাঁচ বছর বয়সেই বিয়ে হতো। আমারও সেটাই হয়েছিল। স্বামী জোয়ান না বুড়ো, কিছুই বুঝিনি। মনেই নেই। আমাকে নিয়ে যে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, তাতেই আমি কৃতার্থ। বিয়ে হবে যাবার পর স্বামীর দেখা আর পাইনি।'

সন ১৮৭২। বিনোদিনী তখন ন' বছরের পরিত্যক্ত বালিকাবধূ। সংসারে যতটুকু উপার্জন, সবই স্থান পায় দিদিমার ট্যাঁকে। শরীর বেচার দাঁড় টেনে বিনোদিনীর মায়ের যতটুকু আয়, সবটুকুই ছোঁ মেরে টেনে নেন দিদিমা। সেই দিদিমাই ওই বছর প্রথমে একটু দোনোমোনা করবার পর জীবন-পাশায় এমন এক চাল দিলেন, যা কিশোরী বিনোদিনীর জীবনে বহন করে আনে বিশেষ এক অর্থবহ পরিবর্তনকে। দিদিমা তাঁর বাড়ির যে ঘরটিতে বিনোদিনীকে থাকতে দিয়েছিলেন, সেখানেই এনে ঢোকালেন আর একটি যুবতীকে। সে বয়সে বিনোদিনীর চেয়ে বড়ো, বেশ চতুর, বটুয়াতে রাখা টাকাটা সিকিটা মাঝে মাঝে গুনে দেখে। নাম গঙ্গামণি। দিদিমার পরোয়ানা মোতাবেক বিভিন্ন বয়সী পুরুষদের তুষ্ট করতে আরম্ভ করলেন গঙ্গামণি। পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত বাঈজীদের তিনি মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ান। গলায় সাবেককালের গান। আবার একঢাল চুলে মুখ ঢেকে গঙ্গামণি যখন নাচেন, অন্যান্য বাঈজীদের পুরানো খাতকদের ভিড় তখন ক্রমে ক্রমে জমে উঠতে থাকে গঙ্গামণির কাছেই। এহেন গঙ্গামণির সঙ্গে বিনোদিনীর হৃদ্যতা দ্রুত গাঢ় হয়ে ওঠে। রসিকতা, হাসাহাসি, কখনও বিনোদিনীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এক দমকা ইংরেজি বাক্য। সব রহস্যই ফরশা হয়ে যায়, যখন দিদিমা একজন দু'জন করে বড়োদরের খদ্দেরকে এনে ঢোকান এই রাঁড়ের বাড়িতে। ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার, হাকিম, কাছারি বাড়ির কেরানি... এই লেভেলের খদ্দেরদেরও টেনে আনেন দক্ষ শিকারি দিদিমা।

এই গঙ্গামণিই পরবর্তীকালে বিনোদিনী এবং একজন জাঁদরেল গ্রাহকের হাত ধরে ঢুকে পড়েন থিয়েটারে এবং আপন রূপে ও গুণে থিয়েটারের কর্তাদের মন জয় করে উঠে পড়েন মঞ্চে। তাঁর অনিশ্চিত অন্ধকারময় জীবনের একটা ফয়সলাও হয়ে গেল চমৎকারভাবে। ঈশ্বর যেন তাঁর নাগালের মধ্যে তুলে আনলেন একটার পর একটা সুযোগ। মঞ্চের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই পোক্ত হয়ে ওঠে। মাত্র এক বছরের মধ্যে সর্বজনমান্য গিরিশ ঘোষ গঙ্গামণিকে সেরার সেরা অভিনেত্রী-গায়িকার শিরোপা প্রদান করেন এবং গঙ্গমণির তাবৎ উন্নতির মূলে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য, সেই নটিনী বিনোদিনীকে হতাশ ও বিহ্বল করে গঙ্গামণিকেই নির্বাচিত করলেন 'বিল্লমঙ্গল' নাটকে মুখ্য নারীচরিত্রে। দিদিমার বাড়িতে অবস্থানকালে গঙ্গামণি বিনোদিনীকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের কিছু তালিমও দিয়েছিলেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল, বিনোদিনী গায়িকারূপেই একদিন বড়োসড়ো প্রতিষ্ঠা পাবেন। গায়িকাদের ফাঁসানো কঠিন অভিনেত্রীদের তুলনায়। সেখানে তাৎক্ষণিক দৈহিক সম্পর্কস্থাপন বিরল। বিনোদিনীর সুললিত কণ্ঠস্বর, সুর-তাল-লয় বোধ গঙ্গামণিকে মুগ্ধ করত, বিনোদিনীকে মাঝে-মাঝেই বলতেন, 'তোর প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ কিন্তু সংগীতে। গান গেয়েই তুই একদিন বাজারমাত্ করবি।'

তবুও দুই সুন্দরীর মধুর সম্পর্ক শেষ অবধি সুখকর হয়নি। স্বার্থসিদ্ধির দৌড়ে গঙ্গামণি বিনোদিনীকে নাটকের মঞ্চ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্যসাধনে ইদানীং বিনোদিনীর বিরুদ্ধে নানাভাবে কর্তাব্যক্তিদের কানভারী করতেও শুরু করেছিলেন। তৎজনিত কারণে বিনোদিনীর হেনস্থাও বাড়ে। বসতবাড়ি থেকে বেরিয়ে থিয়েটার হলে পৌঁছতে একদিন বিলম্ব ঘটায় মঞ্চ ঝাড়ু দেয় যে একরত্তি মেয়েটা, তারও মেজাজ হজম করতে হয়েছিল বিনোদিনীকে। আবার অভিনেত্রী-বাঈজী গঙ্গামণির টানে সমাজের কিছু বিত্তবান মানুষদেরও আগমন ঘটতে থাকে দিদিমার বাড়িতে। তখন আনন্দিত দিদিমার হুকুমে ছোটো পোটলাটাকে বগলে নিয়ে বিনোদিনীকে চলে যেতে হতো অন্য একটা ছোটো, বিশৃঙ্খল ঘরে। আবার ধনবান গ্রাহকদের দু' একজনের নজর বিনোদিনীর দিকে ধাবিত হলেও বিনোদিনী তেমন আগ্রহ দেখাতেন না। ফলে সম্পর্কটা গোড়াতেই নড়বড়ে হয়ে উঠত। সবদিক থেকেই ওই সময়টাতে বিনোদিনীর অবস্থা প্রায় যেন ল্যাজেগোবরে।

তবে মন্দসময়টা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অচিরেই বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন একজন প্রভাবশালী বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁর সমাচার সমকালীন পত্র-পত্রিকাতেও স্থান পেত। তিনি প্রাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। যুগপৎ ধনী ও উচ্চশিক্ষিত। বিনোদিনীর গান শুনে এবং তাঁর

লেখার কিছুটা অংশ পাঠ করে বুঝলেন, এই যুবতীকে নিছক রোজগণ্ডা গুণে দিয়ে বেঁধে রাখা যাবে না। ওঁকে প্রেম ও মায়ার বন্ধনে বেঁধে রাখা দরকার। তদন্তে প্রাণচন্দ্র তৈরি করে ফেললেন তাঁর পরিকল্পনা। গুণী-মানুষ প্রাণচন্দ্র সেই সময়ে অনেক খেটেখুটে লিখে ফেলেছেন একটি গীতিনাট্য। নাম 'সীতার বিবাহ'। তারপরও সন্দেহ— লেখাটা যথাযথ হয়েছে তো? তাই বিনোদিনীকে ডেকে সেই নাটকের দুটি পর্ব পড়ে শোনালেন। নাটকের সংলাপ শুনতে শুনতে বিনোদিনী উঠে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের আবক্ষ দেখতে দেখতে বললেন, 'লেখায় আরও যত্ন আনতে হবে স্যার, বিশেষত পরিবেশটাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে সংলাপেরই মধ্য দিয়ে।' প্রাণচন্দ্র আরও মুগ্ধ হলেন বিনোদিনীর বোধশক্তির পরিচয় পেয়ে। এরপর বিনোদিনী প্রাণচন্দ্রকে একটি গান গেয়ে শোনান। একটি লুপ্তপ্রায় পল্লীগীতি। গানের বিষয়বস্তু— অকেজো তৈজসপত্রকে যদি নতুন করে সাজিয়ে নিতে পার, অন্তরীক্ষে মা লক্ষ্মী তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। গান শুনে প্রাণচন্দ্রের প্রত্যয় দৃঢ়তর হয় যে গুণের বিচারে বিনোদিনী গঙ্গামণির চেয়ে কয়েক যোজন এগিয়ে আছেন।

কিন্তু বাধা সেই বুড়ি ও দাপুটে দিদিমা। তিনি আর বিনোদিনীকে নাটক-ফাটকের দিকে যেতে দেবেন না। বাড়িতেই শরীরে এসেন্সের শিশি ঢেলে দিয়ে অপেক্ষায় থাকো। নায়করা এখানেই আসবে, পুরুষোচিত মেজাজে টাকাও ঢালবে। কিন্তু প্রাণচন্দ্রও হাল ছেড়ে দেবার বান্দা নন। দিদিমার হাতে এক গুচ্ছ টাকা গুঁজে দিতেই বৃদ্ধার সে কী অনৈসর্গিক আহ্লাদ! প্রাণচন্দ্র কথাও দিলেন, তিনি মাঝে মাঝে এসে দিদিমাকে কিছু টাকা দিয়ে যাবেন।

ব্যাস, কেটে গেল বাধা। প্রাণচন্দ্রের প্রথম কাজ হলো, বিনোদিনীর সঙ্গে কলকাতার নাট্যজগতের প্রধান প্রধান চরিত্রদের পরিচয়কে নিবিড় করে তোলা, যাতে বিনোদিনীর রূপ ও গুণের প্রতি ওই মানুষগুলির আগ্রহ ও অনুভব তুঙ্গে পৌঁছে যায়। আপন সহজাত প্রতিভা এবং রূপের জলুসে বিনোদিনীও তখন প্রকৃত তুফান তুলতে পারলেন নাট্যভুবনে। প্রাণচন্দ্রের সঙ্গে বের হবার সময় বিনোদিনী যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন নিজেকে অপরূপা করে তুলতে। তাঁর মুখশ্রী, দেহের গড়ন, অঢেল কেশসম্ভার, উরল বক্ষদ্বয় অবশ্যই দুর্লভ। বাঈজী পাড়ার টোকো গন্ধ তাঁর গুরুত্বকে যাতে ক্ষুণ্ণ করতে না পারে, সেই দিকে বিশেষ নজর রেখেছিলেন প্রাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বিনোদিনীকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন তদানীন্তন নাট্যজগতের প্রধান ব্যক্তিদের নিকট। তাঁদের মধ্যে গিরিশ ঘোষও ছিলেন। প্রাণচন্দ্রই বিনোদিনীকে নিয়ে যান, 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' এ। বাংলার নামী নাট্যপ্রতিষ্ঠান। সত্বাধিকারী ভুবনমোহন অধিকারী। প্রাণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অনেক দিনের। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারকে গড়ে তোলার পিছনে প্রাণচন্দ্রেরও কিছু অবদান ও সংযোজন রয়েছে। সুতরাং বিনোদিনীকে উপেক্ষা করেননি অধিকারী মশাই। বিনোদিনীকে সামনে বসিয়ে তিনখানা গান শুনলেন তাঁর। তাঁরই নির্দেশে একটি নাটকের বই থেকে কিছু সংলাপও শোনাতে হলো বিনোদিনীকে। অধিকারী প্রীত হলেন। উদাত্ত কণ্ঠে প্রাণচন্দ্রকে বললেন, 'হবে, হবে। ভিতরে বস্তু রয়েছে।'

কিন্তু মুশকিল অন্যত্র। চেহারা যতই বাড়ন্ত হোক, ও কিন্তু এখনও যৌবনে পা রাখেনি। বয়স সবে এগারো পেরিয়ে বারোতে পৌঁছেছে। অবশ্য বাঈজীপাড়ার মেয়ে হওয়ায় বয়সের তুলনায় অভিজ্ঞতা যেমন অনেক বেশি, তেমনি লোককে ভোলাবার কায়দাও শিখে ফেলেছে অনেকখানি। ভুবনমোহন অধিকারী রাজি হয়ে গেলেন মেয়েটিকে স্টেজে তুলে আনতে। বিনোদিনীর সঙ্গে লিখিত চুক্তিও হয়ে গেল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের। বিনোদিনী তাঁর আত্মকথায় ওই দিনটিকে তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা দিন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর কাছে সেদিন যা-যা ঘটল, সবই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় এটাকেই বলে মাহেন্দ্রক্ষণ। বেতন স্থির হলো মাসে দশটাকা। নাটকের প্রয়োজনে অভিনয়ের পাশাপাশি গানও গাইতে হতে পারে। তখন ন্যাশনাল থিয়েটারে সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন আরও চারজন উঠতি বয়সের মেয়ে। তাঁদের নাম রাজকুমারী, ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী এবং নারায়ণী। বিনোদিনীর মতো সেই চার জনেরও আগমন নিষিদ্ধপল্লী থেকে। বয়সে ও সাত-সতেরো দফার অভিজ্ঞতায় তাঁরা বিনোদিনীর থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে। কিয়ৎক্ষণ বিনোদিনীর দিকে চেয়ে থেকে চারজনই হেসে উঠলেন একসঙ্গে। অচিরে জমে ওঠে বন্ধুত্ব। নাট্যপর্ব শেষ হলে রাতে পাঁচজনই উঠে আসেন নাট্যশালার ছাদে। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে চার অভিনেত্রীর বিস্তর গল্প, অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান, হি হি হাসি... বহুক্ষণ বসে থাকায় পায়ে ঝিঁঝিঁ। শক্তিরহিত দুই হাত ও কোমরেরও ব্যায়াম করেন তাঁরা। চাঁদের আলো তাঁদের স্নান করায়। তবে কালেভদ্রে হলের দারোয়ান এসে হাজির হয় তাঁদের ভড়কে দিতে। তখন তাঁরা যে যাঁর বাড়ির দিকে হাঁটা দিতে অধীরতা দেখান। তাঁরা কখনও কখনও নিজেদের দুঃখ ও হতাশার কথাও বলেন। নারায়ণী তো একদিন নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে একেবারে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন।

(ক্রমশ...)

কেরলে আবার খুন স্বয়ংসেবক

বামশাসিত কেরলে স্ত্রীর সামনেই খুন করা হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদস্যকে। দেশের একমাত্র বামশাসিত রাজ্য কেরল। এবার আদর্শ গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সেই বাম রাজ্যেই খুন করা হলো একজন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদস্য ২৭ বছরের এস সঞ্জিত-কে। ১৫ নভেম্বর ২০২১, কেরলের পুলিশ জানিয়েছে কান্নুর জেলায় মাম্বারামে এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ সূত্রের খবর আরএসএস কর্মী এস সঞ্জিত-কে সকাল ৯টা নাগাদ তার স্ত্রীর সামনে হত্যা করা হয়। সঞ্জিত বাইকে করে যখন তার স্ত্রীকে কর্মস্থলে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন তখনই এই ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ মনে করছে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অব ইন্ডিয়া এবং ইসলামিক পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার হাত থাকতে পারে এই হত্যাকাণ্ডে। কেরল বিজেপি রাজ্য সভাপতি কে. সুন্দরম অবশ্য এই ঘটনাতে পুলিশ প্রশাসনের গাফিলতিই খুঁজে পাচ্ছেন। এই হত্যার কড়া নিন্দা করার পাশাপাশি তিনি বলেন, 'এটি একটি পরিকল্পিত হত্যা। পালাক্কাড জেলা বিজেপি সভাপতি কে. হরিদাসের মতে এসডিপি আই অত্যন্ত পরিকল্পনা করে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। গোটা ঘটনায় বামেদের হাত দেখতে পাচ্ছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য শাসক দলের মদতেই এই খুন করেছে এসডিপিআই।

কেরলে বাম ও আরএসএস-এর দ্বন্দ্ব বহু পুরোনো। বহু বছর ধরেই কেরলের বাম সরকার বনাম হিন্দুত্ববাদী আদর্শের দ্বন্দ্ব চলে আসছে। শবরিমালা নিয়ে আন্দোলনের সময় যা আরও অন্য মাত্রা পেয়েছে। যদিও দেশের এই একটি প্রান্তেই এখনও টিকে রয়েছে বামেরা। সেই কারণেই এখানে বাম বনাম আরএসএস-এর আদর্শের সংঘাতের দিকেই অনেকে আঙুল তুলছেন আরএসএস কর্মীর মৃত্যু নিয়ে।

তাজপুরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান

গ্রাম বিকাশ পুঞ্জের অধীন মাতৃমণ্ডলীর পরিচালনায় ৮০ জনের উপস্থিতিতে তাজপুর সারদা ভবনে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও মনোজ্ঞ পরিবেশে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হলো। সভাপতি ছিলেন সাব রেজিস্টার তন্ময় চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বিভাগের জুনিয়ার কমিশন অফিসার শ্যামাপদ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কাল্পনিক

আসল ভূত

সোমবারেই গল্পটা জমা দিতে হবে পাবলিশারের ঘরে। আজ শনিবার হয়ে গেল। তাই খাওয়া-দাওয়ার পর রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় অখিলেশ গল্পটা নিয়ে বসেছে। দক্ষিণের জানালাটা খোলা। শীতের রাত। বাইরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। এদিকে গল্পটাও লিখতে লিখতে বেশ ভয়ংকর একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। গল্পের শেষটায় অখিলেশের নিজেরই বেশ ভয় ভয় করতে লাগল। 'ভূত' নামক বস্তুটির কি সত্যি কোনো অস্তিত্ব আছে? এই প্রশ্নটা বেশ কয়েকবার এসেছে অখিলেশের মনে কারণ বিগত আড়াই বছরে ভূতের নামেই ওর এত পরিচিতি। ছোটো গল্প, প্রবন্ধ সব ক্ষেত্রেই বিষয় ওই একটি— 'ভূত'।

অখিলেশ এক মনে লিখে চলেছে। হঠাৎ লোড-শেডিং। কী হলো? বহুদিন পর এসময় কারেন্ট গেল। মোমবাতি কোথায় রেখেছি তো মনে নেই, অখিলেশ বলে চলল নিজের মনে। হঠাৎ জানলার দিকে চোখ পড়তেই ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল শরীরের ভিতর। আবছা অন্ধকারে সাদা একটা অবয়ব। ভয়ে হাত পা সিঁধিয়ে যাচ্ছে বুকের ভিতর। ক্রমশ শরীরটা পাথর হয়ে যাচ্ছে অখিলেশের। হঠাৎ ছায়া মূর্তিটা বলে উঠলো— 'কী রে খুব যে ভূতের গল্প লিখছিস্, ভূতের দর্শন করেছিস কখনো?' অখিলেশের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। তাও চাপা স্বরে বললো— না-আ-আ। তুমি কে?

সাদা ছায়ামূর্তি বললো— সেকি রে! আমায় নিয়ে লিখছিস আবার আমাকেই জিজ্ঞেস করছিস আমি কে? আমায় দেখিসনি কখনো তাহলে লিখছিস কীভাবে? তাই ভাবলাম তোকে একটু সাহায্য করি।

অখিলেশ নিজের কানকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না। 'ভূত' নিয়ে এতদিন কতরকম লেখাই না লিখেছে। মামদো ভূত, ব্রহ্মদত্তি, পেত্নী আরও কত বিচিত্র নাম। ঠাট্টা তামাশা করেও গল্প লিখেছে এদের নিয়ে। সেই ভূত বাবাজী আজ স্বয়ং এসে হাজির! এযে মস্ত বিপদ, এর থেকে ও রেহাই পায় কি করে। ওদিকে জানালার ওপারে সাদা আবছা অবয়ব বলে উঠলো, কীরে কী ভাবছিস? আমি আসি তোর সামনে, ভালো করে দ্যাখ আমায়। তারপর ভালো করে লিখবি। না-না! একেবারেই নয়। আমার সামনে একদম আসবে না। তোমায় দেখলে আমি লিখব কীভাবে? মনে মনে আর্তনাদ করে উঠলো অখিলেশ। কিন্তু যতই ভয় পাক মুখে তা প্রকাশ করলো না। খুব শক্ত হয়েই বললো, তুমি যদি সামনে আসো তবে আমার কল্পনার কী হবে? কল্পনা করেই তো তোমাদের এতরকম বিচিত্র রূপ দিই আমার লেখায়। কত ভয়ংকর সব গল্প লিখি, কত অলৌকিক ঘটনা ঘটে সেসব গল্পে। কখনো লাল টকটকে চোখ, কখনো ২০ ফুট লম্বা হাত। এসব পড়েই তো মানুষরা তোমাদের এত ভয় পায়। এসব নিয়ে সিনেমা তৈরি হয়। তবেই তো তোমাদের এত নাম। আমাদের মতো লেখকরাই তো ভূতকে জনপ্রিয় করেছে। তাই তোমাদের সম্মান জানানো উচিত আমার মতো লেখকদের। আমি যা বলছি এখন তা শোনো। এখান থেকে চলে যাও, অনেক হয়েছে। এবার আমি ঘুমোতে যাব।

এদিকে কথাগুলো বলতে বলতে অখিলেশ শীতকালেও দরদর করে ঘামছে, পাদুটো ঠকঠক করে কাঁপছে। না জানি কখন এসে গলার নলি টিপে ধরে ভূত বাবাজী। ওমা! হঠাৎ একি কাণ্ড! সাদা চাদর গায়ে অবয়ব বলছে— অখিল দরজাটা খোল। আমি মামা। সন্ধ্যের ট্রেন লেট করেছে তাই আসতে রাত হয়ে গেল। বলেই হা হা করে হেসে উঠলো মামা। অখিলেশের এতক্ষণে সম্বিত ফিরে এল। সত্যি তো, মামার গলা। আজ সন্ধ্যে সাড়ে আটটার ট্রেনে ওড়িশা থেকে মামার ফেরার কথা। মনে পড়তেই অখিলেশও জোরে জোরে হেসে ফেলল যেন সত্যি সত্যি ওর একটুও ভয় লাগেনি। কিন্তু মনে মনে ভাবলো, ভূতের গল্প যতই লিখি, চাক্ষুষ ভূত দেখার গা-হিম করা অভিজ্ঞতা যে খুব একটা সুখের নয় তা আজ বুঝলাম। মনে হচ্ছে ঘাড় থেকে ভূত নামলো। যদিও মামা অভিনয়টা পুরো আসল ভূতের মতোই করলেন। পরে এ নিয়েও একটা গল্প লিখে ফেলবো। তবে আরও একবার আমি আজ নিশ্চিত হলাম ভূত বলে আসলে কিছুই নেই, সবটাই আমাদের কল্পনার কারসাজি।

ভারতের বিপ্লবী

তারকেশ্বর সেনগুপ্ত

তারকেশ্বর সেনগুপ্ত ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকারী বীর শহিদ। তাঁর জন্ম ১৫ এপ্রিল ১৯০৫ সালে। ব্রিটিশ ভারতের (এখন বাংলাদেশ) বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে শহিদ তারকেশ্বরের জন্ম। তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম কর্মী। তিনি মাস্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। হিজলি বন্দিশালায় নিরস্ত্র রাজবন্দিদের উপর জেল কর্তৃপক্ষ গুলিবর্ষণ করার ফলে তারকেশ্বর নিহত হন। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ হিজলি বন্দিশালায় তাঁর মৃত্যু হয়।

জানো কী?

- Tee শব্দটি যে খেলার সঙ্গে যুক্ত—গল্ফ।
- 'অর্জুন' পুরস্কারটি খেলার সাথে যুক্ত।
- ভারতের খেলা গবেষণাগারটি পাটিয়ালায় অবস্থিত।
- অ্যাথলিট মিলখা সিংহ, ফ্লাইং শিখ নামে পরিচিত।
- কবাডি খেলায় খেলোয়াড় থাকে ৭ জন।
- দাবা খেলার বোর্ডে ৬৪টি বর্গ থাকে।

ভালো কথা

মায়ের কোলে কুট্টুস

প্রায় দুদিন হলো কুটুসকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছি। কালো আর খয়েরী রঙের বাচ্চা কুকুরটি দেখতে খুব মিষ্টি। আমি ওকে যত্ন করে থালায় করে দুধ খাওয়াচ্ছি। ও দিনের বেশীর ভাগ সময় ঘুমোচ্ছে। যখন উঠে পড়ে, আমার সঙ্গে খুব খেলা করে। আমার মা-বাবাও কুট্টুসকে খুব ভালো বাসে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে রাত্তিরে। সারাদিন ঘুমোনোর পর কুট্টুস রাতে জেগে থাকছে। কিছুক্ষণ পর পর ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। আর ওর নিজের ভাষায় কীরম যেন চ্যাঁচাচ্ছে। মনে হয় ওর মায়ের জন্য খুব কষ্ট হয়। ও মায়ের কথা ভেবে কাঁদে। কাল রাতে এত কাঁদলো, ওকে দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল আমাদের। ভোর সাড়ে পাঁচটায় ভোরের আলো ফুটতেই আমি আর আমার বাবা কুট্টুসকে নিয়ে ওর মার কাছে দিয়ে এসেছি। ওর তিন ভাইবোন আর মা ওকে দেখে খুব আনন্দ পেয়েছে। কুট্টুসও লেজ নাড়তে নাড়তে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অগ্নিদীপ্ত দে,অষ্টম শ্রেণী, হরিদেবপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ইংরেজিটা আসে না

কাকলি মুখার্জি, বেলুড়, হাওড়া।

বাংলা আমার মায়ের ভাষা, বাংলা আমার নাড়ীর টান।
আমৃত্যু করব আমি এই বাংলার জয়ো গান।।
ইংরেজিতে বলতে গেলে আবেগে মন ভাসে না।
সত্যি বলছি এই কারণেই ইংরেজিটা আসে না।।

আমার প্রথম শিক্ষালাভের সূত্র হলো সহজপাঠ।
বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ থাকুক মাথায় এঁদের হাত।।
ইংরেজিটা বলতে গেলেই ভেতর থেকে লাগে ভয়
তাইতো বলি বেঁচে থাকুক আমার বর্ণপরিচয়।।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

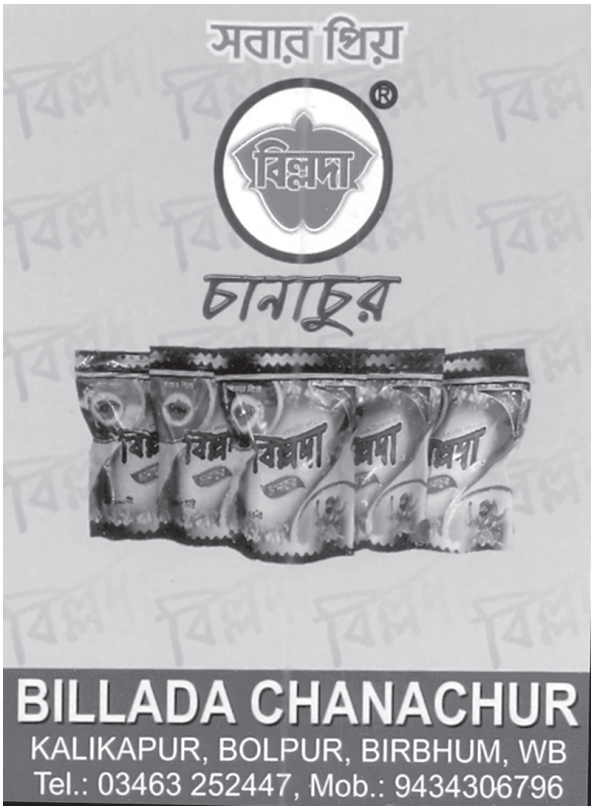

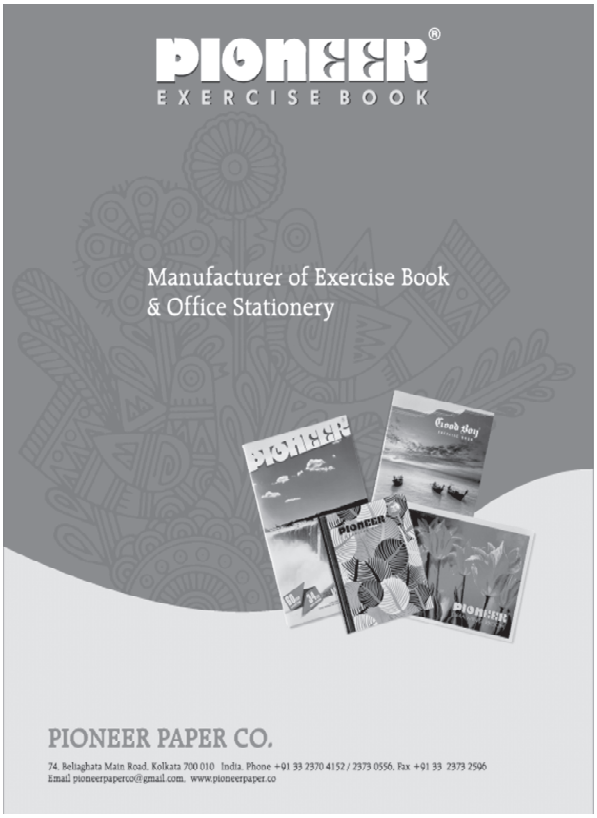

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ভারতে তালিবানি হামলার আশঙ্কা অমূলক

দুর্গাপদ ঘোষ

এ বছরের ৫ এবং ৭ অক্টোবর জম্মু-কাশ্মীরে সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দু-শিখদের (শিখরাও আদতে হিন্দু) নিশানা করে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানের পালিত ও পোষিত ইসলামি জঙ্গিরা। প্রথম দিন জম্মু ক্ষেত্রের পুঞ্চ জেলায় হত্যা করেছে একজন কাশ্মীরি পণ্ডিতকে এবং বিহার থেকে আসা একজন হিন্দু শ্রমিককে। দ্বিতীয় দিনের ঘটনা আরো বেশি উল্লেখযোগ্য। সেদিন জম্মু ক্ষেত্রের রাজৌরি জেলায় একটা স্কুলের মধ্যে ঢুকে একজন হিন্দু শিক্ষক এবং ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক একজন শিখকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এবারই প্রথম জম্মু-কাশ্মীরে হিন্দুদের ওপর পাক সন্ত্রাসবাদী হামলার একটা ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছে, সেখানে এবং বিহারসহ ভারতের আরও কয়েকটা জায়গায়। তাতে এদেশের কায়েমি স্বার্থবাদী বুদ্ধিজীবিরা অবশ্য যথারীতি ভারতের পরম্পরাগত সহিষ্ণুতার সামনে বিপদের গন্ধ পেয়ে এবারও তওবা...তওবা করতে বাকি রাখেননি। এতদিন যাবৎ তাঁরা সেনাবাহিনীর তরফে জঙ্গি এবং পাথরবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার ক্ষেত্রেই কেবল মানবাধিকার লঙ্ঘন-এর গল্প শুনে এবং যুথবদ্ধভাবে বিরোধিতা করে এসেছেন। উল্লেখিত দুই ঘটনাসহ অক্টোবর মাসের প্রথম ৭ দিনে ৪ জন হিন্দু এবং ৩ জন স্থানীয় মুসলিমসহ মোট ৭ জন সাধারণ মানুষ সন্ত্রাসবাদীদের সহজ নিশানা হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এ বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরে ইসলামি জঙ্গি হানায় মোট ২৮ জন নিরীহ মানুষকে নরপিশাচদের

হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। তার মধ্যে ২১ জন মুসলিম, ৭ জন হিন্দু। অর্থাৎ এখন আর কেবল কাশ্মীরি পণ্ডিত বা নিরীহ হিন্দুরাই নয়, সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি তথা পাকিস্তানের নিশানা হচ্ছেন হিন্দু-মুসলমান সব ধর্মেরই সাধারণ মানুষ। এছাড়া গত ১১ অক্টোবর থেকে জঙ্গি-বিরোধী অভিযান চালানোর সময় একই দিনে ৫ জন সহ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ১১ জন সেনা জওয়ানও শহিদ হয়েছেন। তবে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শেষ খবর যা পাওয়া গেছে তাতে পুঞ্চ এবং রাজৌরি জঙ্গলে জঙ্গিদের খোঁজে সেনা অভিযান বহাল ছিল। এই সমস্ত ঘটনায় একটা বিষয় পরিষ্কার যে কাশ্মীরে তুষারপাত শুরু হবার আগে পাকিস্তান সেখানে জঙ্গি তৎপরতা যথাসম্ভব বাড়িয়ে বেশি সংখ্যায় নরহত্যার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেছে। গত ১ নভেম্বর গোয়েন্দা সূত্রের খবর মোতাবেক সীমান্তের ওপারে ২০০ থেকে ২৫০ জঙ্গিকে পাক সেনাদের গোলাগুলি বর্ষণের তলা দিয়ে অনুপ্রবেশ করানোর জন্য জড়ো করেছে আই. এস. আই। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে ভারতীয় নিরাপত্তা রক্ষী ছাড়াও সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে হিন্দুদের যেভাবে নিশ্চিহ্ন করা হত পাকিস্তান ফের তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। যতদিন পর্যন্ত কাশ্মীরে হিন্দুরা পর্যাপ্ত সংখ্যায় ছিলেন ততদিন বেছে বেছে তাঁদের নিশানা করা হত। ১৯৮৬ সালে উপত্যকার শুধু অনন্তনাগেই ৪৫টা মন্দির গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯০-এর দশকে একদিন রাজৌরিতে চলন্ত বাস থামিয়ে যাত্রীদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে ২৬ জন হিন্দুকে নিচে নামিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। তাতে অবশ্য মার্কামারা বুদ্ধিজীবিরা মানবতা লঙ্ঘন দেখতে পাননি। জঙ্গির কাজ জঙ্গি করেছে বলে এড়িয়ে গেছেন। উল্লেখিত দু'দশকের মধ্যে ৩ লাখের বেশি হিন্দু প্রাণভয়ে কাশ্মীর ছেড়ে পালানোর পর এখন তাঁদের সংখ্যা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। তার পরেও যে ক'জন হিন্দু সাহসে ভর করে থেকে গেছেন তাঁদের সঙ্গে কাশ্মীরি মুসলিমদেরও নিশানা করা শুরু হয়েছে মোটামুটি ২০০০ সাল থেকে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কাশ্মীরি নারীদের ওপর হিংস্র নজর পড়েছে নরদানব জঙ্গিদের। ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী এবং কাশ্মীরি পুলিশ অবশ্য হাত গুটিয়ে বসে নেই। বার বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে গুলিগোলা চালাতে থাকা পাক সেনাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার কসুর করছে না। সেই সঙ্গে জঙ্গি-বিরোধী অভিযানও অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত নিকেশ করা হয়েছে ১৪৫ জঙ্গি। আরও ৯ জঙ্গি ধরা পড়েছে। তাদের কেউ কেউ বন্দুক ছেড়ে নিজেদের পরিবারের কাছে ফিরে যাবার আকুতি জানিয়েছে। উল্লেখ্য, অক্টোবরের গোড়ার দিকের উল্লেখিত ৩টে ঘটনাই ঘটেছে পাকিস্তানি সেনাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তালিবানদের আফগানিস্তান দখল করার পরে। তালিবান জঙ্গিরা কাবুল দখল করেছে ১৫ আগস্ট। সেই সঙ্গে নির্মম ক্রুরতায় বহু মানুষকে হত্যা এবং পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। যেমনটা ঘটেছিল ১৯৪৭ সালের ২২ থেকে ২৭ অক্টোবরের

ফঃ ৬

মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের একাংশে। সেবার 'অপারেশন গুলমার্গ' নামে সেই অভিযানে 'হানাদার বাহিনী'-র ছদ্মবেশে সদ্য গঠিত পাকিস্তানের সেনারা মাত্র ৫ দিনের মধ্যে প্রায় ৩৫ হাজার কাশ্মীরি হিন্দুকে হত্যা করেছিল। হামলাকারীরা চলে এসেছিল শ্রীনগরের প্রায় দোরগোড়া পর্যন্ত। ভারতীয় উপমহাদেশে সেটাই ছিল বস্তুত পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। পাক মদতে সেদিনের সেই 'হানাদারী' সন্ত্রাসের বিভীষিকার কথা স্মরণ করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে এখন অনেকে আশঙ্কা করছেন যে অতঃপর জম্মু-কাশ্মীরসহ সমগ্র ভারতে অন্যান্য জঙ্গি ছাড়াও তালিবান জঙ্গি অনুপ্রবেশ এবং তাদের নারকীয় বর্বরতা শুরু হয়ে যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এই আশঙ্কাকে একেবারে অমূলক বলা যায় না। কারণ প্রথমত, তালিবানদের পিছনে রয়েছে পিশাচরূপী সেই পাকিস্তান। দ্বিতীয়ত, এর আগে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তালিবানরা প্রথমবার যখন আফগানিস্তানে তালিবানি শাসন কায়েম করেছিল সেই সময়কার মধ্যেই ভারতীয় সংসদে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছিল। একই সময়কালের মধ্যে আক্রান্ত হয়েছিল জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা। কাশ্মীরে আত্মঘাতি জঙ্গি হামলার ঘটনাও সেই সময় অনেক বেশি ঘটেছিল। এই প্রেক্ষিতে আশঙ্কাকারীদের অনুমান, এবারও পাকিস্তান ভারতে সন্ত্রাসবাদী হামলা বাড়িয়ে তোলার জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালাবে। সে দেশের পূর্ব দিকে যেসব সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী যেমন লস্কর-ই-তৈবা তথা জামাত-উদ্-দাওয়া, হিজবুল মুজাহিদিন, জৈশ-ই-মহম্মদ ইত্যাদির সঙ্গে তালিবান জঙ্গিদেরও মোতায়েন করিয়ে তাদের ভারতের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে আফগানিস্তানে তালিবানদের পিছনে থেকে পাকিস্তান আপাতদৃষ্টিতে সফল হবার পর ভারতের বিরুদ্ধে নাশকতা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করছে ,এবং করবে। কিন্তু সেটা যে তালিবানদের সামনে রেখে কিম্বা তাদের সঙ্গে নিয়ে করবে এটা মনে করার কারণ নেই। অনেকে এমন আশঙ্কাও করছেন যে পাকিস্তান কেবল জম্মু-কাশ্মীরের দিক থেকেই নয়, বাংলাদেশেও তালিবানদের ঘাঁটি তৈরি করিয়ে সেখানকার জামাত-ই-ইসলামি, আনসার বাহিনী, রাজাকার বাহিনী, হুজি ইত্যাদি এবং মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করা রোহিঙ্গা মুজাহিদিনদের সঙ্গে জোট বাঁধিয়ে ভারতের পূর্বদিকে পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমসহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তাণ্ডব চালানোর চেষ্টা করবে। তবে এটাকেও নিতান্ত আশঙ্কা বলেই মনে করা যেতে পারে। কেননা, তার অনেকগুলো দিক আছে। যা ১৯৪৭ সালে কাশ্মীরে এবং ২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তানে ছিল না। বাংলাদেশে যতক্ষণ শেখ হাসিনা তথা আওয়ামি লিগের এবং ভারতে যতক্ষণ নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপি-র সরকার থাকবে অন্তত ততক্ষণ এসব আশঙ্কাকে অমূলক বলেই ধরে নেওয়া যায়। পাকিস্তান খুব ভালই জানে যে মার্কিন সেনা প্রত্যাহৃত হওয়ার পর প্রায় অরক্ষিত ও হীনবল আফগানিস্তান আর পাকিস্তান তো নস্যিতুল্য, চীনের মতো সম্প্রসারণবাদী বড় শক্তির সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে যাওয়া, সামরিক সজ্জায় সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত ভারতবর্ষ এক নয়। ভারতের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধে নেমে পাকিস্তানকে ১৯৪৭, ১৯৬৫, ১৯৭১ এবং ১৯৯১ সালে যথাক্রমে কাশ্মীর, ছাম্ব, পূর্ব-পাকিস্তান এবং কার্গিলে অন্তত ৪ বার পরাজয়ের গ্লানি হজম করে পালাতে হয়েছে। এছাড়া সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং বালাকোটে এয়ার স্ট্রাইক করে মোদির ভারত পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে পাকিস্তানের কাছে ভারতবর্ষ তীক্ষ্ণ কাটাওয়ালা মাদার গাছ। এখানে গা ঘঁষতে এলে পাকিস্তানের পিঠের ছাল-চামড়া উঠে যাবে। তাছাড়া নিজেদের তৈরি করা জঙ্গিদের দাপাদাপিতে নাস্তানাবুদ পাকিস্তানের নিজের অস্তিত্বই এখন সংকটের মুখে। পশ্চিম থেকে পূর্বে একের পর এক প্রদেশে পাকিস্তান থেকে পৃথক হওয়ার জন্য কার্যত বিদ্রোহ চলছে। এই অবস্থায় পাক কর্তারা নিজেদের বাঁচানোর তাগিদে একইসঙ্গে তাঁদের দেশের দুই দিকে তালিবানদের মোতায়েন করার মতো নির্বুদ্ধিতার কাজ করতে যাবেন বলে মনে হয় না। যদি তাঁরা তা করেন তবে পাকিস্তানটাই আর পাকিস্তান থাকবে বলে মনে করা ভুল হবে। পাকিস্তান তাহলে তালিবানিস্তান তথা আফগানিস্তানের মতো 'ইসলামি আমিরশাহী'-তে রূপান্তরিত হয়ে যেতে দেরি লাগবে না। উপরন্তু পাকিস্তানের হাত থেকে দখলিকৃত কাশ্মীরের পুনরায় ভারতভুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাওয়াটাও অসম্ভব নয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কাশ্মীরে ১৯৯০-এর দশকে অনবরত জঙ্গি হামলা চলার সময় জঙ্গিদের মধ্যে কয়েকজন আফগানিও ছিল বটে, কিন্তু ভারতীয় সংসদ এবং জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় হামলা তালিবানরা করেনি। সংসদে হামলার মূল পাণ্ডা আফজল গুরু তালিবানি ছিল না। আর মোদি সরকার এখন পাক জঙ্গিদের কেবল জেহাদি জঙ্গি হিসাবেই দেখছে না। দেখছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী বা শত্রু রাষ্ট্রের ছদ্মবেশি সেনাবাহিনী হিসাবে। যে কারণে জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে জঙ্গিদের তৎপরতাকে প্রায় যুদ্ধের দৃষ্টিতে নিয়ে সমস্ত নিরাপত্তারক্ষী এমনকি সেনাবাহিনীকেও খোলা হাতে মোকাবিলার অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং কাশ্মীরে গিয়ে সেনাবাহিনীকে 'জিরো টলারেন্স' এর নির্দেশ দিয়ে এসেছেন। গত ২৪-২৫ অক্টোবর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও কাশ্মীরে মোতায়েন নিরাপত্তা রক্ষীদের এক সমাবেশে দৃঢ়তার সঙ্গে একই নির্দেশ দিয়েছেন। বাহিনীও গত ১১ অক্টোবর থেকে একটানা অভিযান চালিয়ে গেছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সে অভিযান বন্ধ করা হয়নি। এতদিন ধরে একটানা জঙ্গিবিরোধী অভিযান এটাই প্রথম। এর আগে একটানা সেনা অভিযান চালানো হয়েছিল ২০০৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর থেকে ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত, ৯ দিন ধরে। এবার অন্তত প্রায় মাসখানেক ধরে এই একটানা সেনা অভিযান থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তালিবানদের আফগানিস্তান দখলের পর পাকিস্তান যে

জঙ্গি মদতে আরো বেশি মাত্রায় গা ঢেলে দেবে ভারত সরকার সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল। জম্মু-কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং-এর একটা সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে গত ২৬ অক্টোবর। বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম 'জি নিউজ'-এ সম্প্রচারিত সেই সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন যে সরকার নিরাপত্তা বাহিনীকে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে 'অল আউট' অভিযানের খোলা ছুট দিয়েছে। সেইমতো জঙ্গি সাফাই অভিযান আরো বেশি জোরালো করা হয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে জঙ্গি অনুপ্রবেশ কিছুটা কমেও গেছে। জঙ্গিরা এখন আর আগের মতো লাগাতার হামলা চালাতে পারছে না বলে নিরীহ মানুষদের ওপর হামলা করছে। ৫ এবং ৭ অক্টোবরে হিন্দুদের ওপর হামলাকে তিনি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুসারে পাকিস্তান এখন হতাশায় ভুগছে বলে মরিয়া হয়ে এসব করানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী Retaliation বা পাল্টা ব্যবস্থাও অনেক জোরালো করেছে। লস্করের ৫ জন কমাণ্ডারকে খতম করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর পাথরবাজি প্রায় বন্ধ রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে প্যালেট গান ব্যবহারও প্রায় বন্ধ।

জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন করে হিন্দুদের নিশানা করার পিছনে পাকিস্তান এবং সন্ত্রাসবাদীদের কাপুরুষোচিত দুর্বলতা কাজ করছে মনে করা যেতে পারে। হিংস্র শ্বাপদরা সাধারণত তখনই নরখাদক হয়ে ওঠে যখন তারা আহত কিম্বা হীনবল হয়ে পড়ে। শিকারের সঙ্গে লড়াই করে তাকে কাবু করার ক্ষমতা যখন হারিয়ে ফেলে তখনই তারা মানুষের মতো নিরীহ প্রাণীদের সহজ নিশানা করে। ভারতের দৃঢ়তায় এখন আন্তর্জাতিক জঙ্গি প্রজনন ক্ষেত্র পাকিস্তান তাদের ফ্রাঙ্কেনস্টাইনদের দাপটে এবং আর্থিক অনটনে দুর্বল হয়ে পড়েছে বলেই সাধারণ ও নিরীহ মানুষদের সহজ নিশানা করতে চাইছে। আই এস আই যে জঙ্গিদের ভারতে ঢুকে বেশি সংখ্যায় মানুষ হত্যা করার জন্য জনবহুল এলাকা, বিশেষ করে উৎসব অনুষ্ঠানে হামলা করার নির্দেশ দিচ্ছে কিছুদিন যাবৎ এরকম খবর মিলছে যাকে বলে স্যাঁকরার ঠুক-ঠুকের মতো পাকিস্তান এখন এসব করে যেতে থাকবে। কারণ, কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত-বিরোধিতার জিগিরই তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার সম্বল। সেদেশের ক্ষমতাসীনরা যখন যখন নিজেদের ডামাডোলে ক্ষমতাচ্যুত হবার সম্ভাবনা টের পেয়েছেন তখনই তাঁরা জঙ্গিদের সামনে রেখে এটা করানোর চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু ভারত পাল্টা ঘা যখন মেরেছে তখন তা কামারের ঘা-এর মতো হয়েছে। সাম্প্রতিক কালেও হচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ২০২০ সালের ৩০ জুনের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছিল ১০৩ টে। ২০২১-এর ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত হয়েছে ৭১টা। গত বছর মোট ১০৫ জঙ্গিকে খতম করা হয়েছিল। এবছর ২ মাস বাকি থাকতে নিকেশ হয়েছে ১৪৫ জন জঙ্গি। তার মধ্যে লস্করের ৫ জন দুর্দ্ধর্ষ কমাণ্ডারও আছে। প্রসঙ্গত, এ বছরের ১৬ জুলাই পর্যন্ত ৬৭ জঙ্গিকে মারা হয়েছিল। তারপর মাত্র সাড়ে ৩ মাসের মধ্যে খতম করা হয়েছে আরও ৭৮ জঙ্গিকে। আফগানিস্তান তালিবানি কব্জায় চলে যাবার পর ভারত জঙ্গি-বিরোধী অভিযানে কত বেশি জোর দিয়েছে এ থেকেই তো বোঝা যাচ্ছে। ডিজিপি দিলবাগ সিং-এর বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে যে মধ্য আগস্ট থেকে অক্টোবরের ২০ তারিখের মধ্যে হিন্দু-শিখ স্কুলে বর্বরচিত ওই হামলাসহ জম্মু-কাশ্মীরে উল্লেখযোগ্য জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে মাত্র ২টো। তারপর অবশ্য সি.আর.পি. এফ-এর ওপর আরও একটা ঘটনা ঘটেছে। তাতে ২ জন জওয়ান আহত হয়েছেন। কাশ্মীর থেকে জঙ্গি নিয়োগের ঘটনাও কমে এসেছে। গত বছর ৭৩ জন কাশ্মীরি যুবক যোগ দিয়েছিল। এ বছর এখনো পর্যন্ত যোগ দিয়েছে ৫৭ জন। তাদের ৩৪ জনই এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে ৯ জন। ধৃতদের কয়েকজন জানিয়েছে যে তাদের হয় লোভ নয়তো ভয় দেখিয়ে জঙ্গি শিবিরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে নিরাপত্তা জওয়ান নিহত হওয়ার সংখ্যাও অনেকটা কমেছে। ২০২০ সালে মোট ৬২ জন বীরগতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ২০২১-এর ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত একদিনে ৫ জনসহ নিহত হয়েছেন ১১ জন। গত বছর ৩৭ জন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছিলেন। এবছর উল্লেখিত তারিখ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ২৮ জন। বরাবরের বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তান অনবরত যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে সীমান্তে গুলিগোলা চালিয়ে জঙ্গিদের ভারতে ঢোকানোর চেষ্টা বহাল রেখেছে বটে কিন্তু আই.এস.আই আগের মতো আর সফল হতে পারছে না।

সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে ভারতের এইরকম কঠোর মনোভাবে পাকিস্তান যে তালিবানদের এদিকে নিয়ে আসতে চাইবে না এতে ভিন্ন মতের অবকাশ নেই। পাকিস্থান চাইলেও তালিবানরা এদিকে হামলা চালাতে আসবে না। ভারতের কাছে পাকিস্তানের বার বার পর্যুদস্ত হবার কথা তারা জানে না তা নয়। তাছাড়া শক্তিশালী ও দৃঢ়চেতা প্রতিপক্ষের সামনে পড়লে তারা যে নিতান্ত তালপাতার সিপাই আফগানের একটা ছোট প্রদেশ পঞ্জশিরে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তালিবানরা এবারও পঞ্জশির দখল করতে পারেনি। পাকিস্তানের আরও একটা ভয় আছে। তাদের জবরদখল করে রাখা কাশ্মীরের (পক) মধ্যে দিয়ে তালিবানদের 'হানাদার' সাজিয়ে ভারতে ঢোকানোর চেষ্টা করা হলে ভারত পাকে-র মধ্যে 'হট পারস্যুট' করে তাদের মারতে মারতে পাকিস্তানের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সেটা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনো কনভেনশনাল কিম্বা ঘোষিত যুদ্ধের পর্যায়ে পড়বে না। জঙ্গি-বিরোধী অভিযানের ক্ষেত্রে এটা করা যায়। লেবানন, জর্ডন, গাজা, স্ট্রিপ, প্যালেস্টাইন ইত্যাদির মধ্যে ঢুকে ইজরায়েল বার বার আক্রমন করেছে। ভারত নিজেও মায়ানমারে ঢুকে তা করেছে পরেশ বরুয়াপন্থী আলফা-বিরোধী অভিযানে। পকের মধ্যে সার্জিক্যাল এবং এয়ার স্ট্রাইককেও বস্তুত হট পারস্যুটই বলা যেতে পারে।

তালিবানদের আফগান দখলের মতো জঙ্গিরা ভারতে কোনো অভিযান চালায়নি। কিন্তু তালিবানদের দিয়ে সেটা করানোর চেষ্টা হলে তাদের খেদানোর জন্য ভারত পাকিস্তানের মধ্যে ঢুকে জঙ্গি প্রশিক্ষণ ঘাঁটিগুলো উড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও পাক দখলিকৃত কাশ্মীরকে নিজেদের দখলে নিয়ে নিতে পারে। পাকিস্তান সরাসরি সামনে এলে তা সরাসরি ভারতের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' হিসাবে পরিগণিত হবে। মোদির ভারত তাতে পিছপা হওয়ার পাত্র নয়। পাক কর্তারা নিজেদের 'পরমাণু শক্তি' বলে যতই চিৎকার-হুঙ্কারই করুন না কেন, তাঁরা জানেন ভারতও পরমাণু শক্তিধর দেশ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে রেখেছেন যে ভারত দীপাবলী উৎসবের জন্য পরমাণু অস্ত্র বানিয়ে রাখেনি। উপরন্তু মোদি সরকার আগের সরকারের পরমাণু নীতি সংশোধন করে প্রয়োজনে প্রথমে ব্যবহার করার নীতিও গ্রহণ করেছে। পাকিস্তান চাইলেই পরমাণু বোমা প্রয়োগ করবে এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আর পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র কোনো কারণে জঙ্গিদের হাতে চলে গেলে বা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলে সারা বিশ্ব একজোট হয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এক মুহূর্তও দেরি করবে না। যার পরিণতিতে সবার আগে বিশ্বের মানচিত্র থেকে পাকিস্তানের অস্তিত্বই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। পাক কর্তারা এতবড় ভুল করার মতো নির্বোধ নন। সুতরাং ভারতেও তালিবানি অভিযানের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক।

আর যাঁরা বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে তালিবানদের ভারতে হামলা চালানোর আশঙ্কা করছেন তাঁদের আশঙ্কাও যে একেবারে যুক্তিহীন এমন নয়। তবে সে সম্ভাবনাও যাকে বলে সুদূর পরাহত। ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বিচ্ছন্ন হওয়া বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মানসিকতা থেকে পাকিস্তান কোনোদিনই বেরিয়ে আসতে পারবে না। মরণ কামড় দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবেই। কিন্তু সেখানে পাকিস্তানের পশ্চিম প্রান্ত থেকে তালিবানদের নিয়ে গিয়ে মোতায়েন করা এককথায় অসম্ভব। কেননা, তা করতে হলে তাদের নিয়ে যেতে হবে আরব সাগর, ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগর দিয়ে। সেটা প্রচুর সময় এবং খরচ সাপেক্ষ। উপরন্তু প্রচণ্ড ঝুঁকির বিষয়ও। উল্লেখিত ৩টে জলপথেই রয়েছে ভারতের মিত্রশক্তিরা। ভারতের লাক্ষাদ্বীপ এবং আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ছাড়াও মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশকে এড়িয়ে পাকিস্তানের পক্ষে তা করা বস্তুত সম্ভব নয়। মায়ানমারও রোহিঙ্গা মুজাহিদিনদের নিয়ে উদ্যত। তারাও তালিবানদের ধার কাছ দিয়ে বাংলাদেশে যেতে দেবে না। উপরন্তু বাংলাদেশের হাসিনা সরকারও ভারতের মতো জঙ্গি-বিরোধিতায় জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে। শেখ হাসিনা আই.এস.আই-এর চক্রান্তজাল সম্পর্কে যথেষ্ঠ ওয়াকিবহাল। ২০০৯ সালে উগ্রবাদী জামাত-এ-ইসলামি সাম্প্রদায়িক ও ভারত-বিরোধী সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার পর থেকে টানা ১২ বছর ধরে হাসিনা সরকার বহু উগ্রবাদী নেতাকে যেমন ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে তেমনি আলফা, এন এল এফ টি, রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি ইত্যাদি জঙ্গি প্রশিক্ষণ ঘাঁটি উৎখাত করে দিয়েছে। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ভারতের সঙ্গে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে। মোদির মতো হাসিনারও লক্ষ্য জঙ্গিমুক্ত বাংলাদেশ এবং উন্নয়ণ। সুতরাং আই.এস.আই চেষ্টা যদি করেও তাহলেও বাংলাদেশ তালিবানদের মতো জঙ্গিদের যে কোনোভাবেই সেখানে পা রাখতে দেবে না সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ এবং ভারত দু'দেশেই পাকিস্তানপন্থী পঞ্চম বাহিনী সক্রিয় রয়েছে। তাদের মধ্যে জঙ্গিদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া বেশ কিছু সাধারণ মানুষরা ছাড়াও তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের একাংশ এবং বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা যাদের সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে তারাও প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে পঞ্চম বাহিনীর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে থাকা লোকও ধরা পড়ছে যারা সরাসরি সন্ত্রাসবাদীদের মদতদাতা। গত ২ নভেম্বর এরকম দু'জনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। তাদের একজন হল জম্মু-কাশ্মীরের জেলখানাগুলোর এক ডেপুটি সুপরিনটেন্ডেন্ট এবং আর একজন দক্ষিণ কাশ্মীরের এক সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বীজবেহারার এই স্কুলের শিক্ষক এবং ডেপুটি জেলার নিযুক্ত হয়েছিল যথাক্রমে ওমর আবদুল্লা এবং ফারুক আবদুল্লা সরকারের জমানায়। দুজনেরই বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে দেশবিরোধী তৎপরতা চালানোর অভিযোগ মিলেছে। বলা বাহুল্য, এসব উদাহরণ তথা ধরা পড়াদের সংখ্যা নিতান্ত ভাসমান বরফের দৃশ্যমান অংশ মাত্র। হয়তো আমার-আপনার আশেপাশেই পঞ্চম বাহিনীর লোক রয়েছে যারা ধর্মনিরপেক্ষতা, উদারবাদ, মানবতাবাদ ইত্যাদি বুলি আউড়ে সাধারণ এবং দেশপ্রেমী মানুষদের বিভ্রান্ত ও দেশবিরোধী মানসিকতার বীজ রোপণ করে যাচ্ছে। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী মানুষকে বিভ্রান্ত করে পাকিস্তান এবং জঙ্গি দরদী বানানোর কাজে লিপ্ত রয়েছে। এদের সম্পর্কে আরো বেশি সাবধান ও বেশি সতর্ক থাকা জরুরি। এরা কিন্তু তালিবান কিম্বা রক্তপিপাসু অন্যান্য জঙ্গিদের চাইতে আরো অনেক বেশি বিপজ্জনক। কেননা এরা শিকড়চাঁদা সাপের মতো ফণা না তোলা বিষাক্ত সাপের মতো সমাজ এবং জাতিকে বিষে জর্জরিত করে তুলছে। এককথায় এই শ্রেণীর পাকা মাথার বিদেশি গুপ্তচর। ভারতে মোদি এবং বাংলাদেশে হাসিনা সরকার বহাল হওয়ার পর থেকে এরকম অনেকেই পার পাচ্ছে না। তাই বলা বাহুল্য, পাকিস্তানি জঙ্গি এবং বিদেশি গুপ্তচরদের হাত থেকে দেশকে নিরাপদ রাখতে হলে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা বা তাঁর দল আওয়ামি লিগ এবং ভারতে মোদি কিম্বা বিজেপি সরকারকে ক্ষমতায় আসীন রাখা একেবারে অনিবার্যভাবে জরুরি। ▯

দেশের ক্রীড়া ভবিষ্যৎকে শক্তিশালী করতে প্রস্তুত হচ্ছে ভারত

টোকিয়ো অলিম্পিক ভারতের খেলাধুলার ইতিহাসে মাইলফলক স্থাপন করেছে। আমরা অ্যাথলেটিক্সে প্রথম স্বর্ণপদক জিতেছি, হকি দল অসাধারণ খেলেছে এবং সাফল্যও পেয়েছে, ডিস্ক থ্রো, গল্ফ, ফেন্সিং-এর মতো অন্যান্য খেলাতেও আমরা ভালো ফল করেছি। 'টার্গেট অলিম্পিক পডিয়াম স্কিম', 'খেলো ইন্ডিয়া' এবং ফিট ইন্ডিয়া ক্যাম্পেন বৃহত্তর সাফল্যের ভিত্তি স্থাপন করেছে। খেলাধুলায় দক্ষতা অর্জনের প্রচেষ্টায় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

অনুরাগ ঠাকুর

নীরজ চোপড়াকে চুরমা খাওয়ানো বা অলিম্পিক পদকপ্রাপ্ত পিভি সিন্ধুকে আইসক্রিম খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি পূরণ করা বা বজরং পুনিয়ার সঙ্গে হাস্যালাপ অথবা রবি দহিয়াকে আরও হাসতে বলা এবং মীরাবাই চানুর অভিজ্ঞতা শোনা, এই ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতা প্রতিটি ভারতীয়ের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। টোকিয়ো অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ক্রীড়াবিদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত আলাপ মানুষের মনে উৎসাহ তৈরি করে। এরপরে তিনি প্যারালিম্পিক্স দলের সদস্যদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের অনুপ্রেরণামূলক জীবনকাহিনি জানেন।

এই ধরনের ঘটনাগুলি নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিত্বের আরেকটি দিক নির্দেশ করে— এমন একজন ব্যক্তি যার খেলাধুলার প্রতি আবেগ ও উৎসাহ আছে এবং যিনি ভারতের ক্রীড়াবিদদের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত। টোকিয়ো গেমস শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রস্তুতির খবর নেওয়ার জন্য একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা সভা করেছিলেন। যারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন তাঁরা জানেন যে প্রধানমন্ত্রী তরুণদের মধ্যে খেলাধুলার সংস্কৃতিকে সমর্থন করার জন্য ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখিয়েছেন। গুজরাট যদিও ক্রীড়া শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পরিচিত নয়, তবুও সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি তৃণমূল স্তর থেকে খেলাধুলার উন্নয়ন করার জন্য 'খেলা মহাকুম্ভে'র উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

কিছুদিন আগে, ২০১৩ সালের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। সেই ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুনায় কলেজ ছাত্রদের একটি সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন, যেখানে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, ভারতে বিপুল সংখ্যক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছেন এবং দেশেরও ক্রীড়া শ্রেষ্ঠত্বের ইতিহাস রয়েছে, কিন্তু অলিম্পিক্সে পদক জয়ের লড়াইয়ে আমরা পিছিয়ে থাকি। তিনি বলেন, ভারতের মতো দেশের অলিম্পিকের অসফল হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তিনি বলেন, সমস্যাটি আমাদের খেলোয়াড়দের নয়, বরং সঠিক সহায়ক পরিবেশ তৈরির অভাব রয়েছে। খেলাধুলাকে যথাযথ সমর্থন ও মর্যাদা দিতে হবে। মহিলা ও পুরুষ হকি দলের সদস্যরা জানিয়েছে, পরাজয়ের পর প্রধানমন্ত্রীর ফোনকল তাঁদের মনোবল বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। ২০১৯ সালে নীরজ চোপড়া যখন গুরুতর আঘাত পান, প্রধানমন্ত্রী তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছিলেন। একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে

তাঁর এই খোঁজখবর নেওয়ার মানসিকতা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। যদি আমরা খেলাধুলার কথা বলি, প্রধানমন্ত্রী খেলাধুলায় সফলতা অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন যে দেশে খেলাধুলার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে কিন্তু যখনই অভিভাবকদের উৎসাহ বা শিশুদের অংশগ্রহণের কথা আসে, তখন বিস্তৃত ব্যবধান দেখা যায়।

অলিম্পিক পদকপ্রাপ্তদের সঙ্গে দেখা করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'খেলাধুলায় ভারতের সাম্প্রতিক চমকপ্রদ সাফল্য দেখে আমি নিশ্চিত যে, খেলাধুলার প্রতি অভিভাবকদের মনোভাবে দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন ঘটবে।' এই মন্তব্যে সত্য ও আশা দুটোই ছিল। অভিভাবকেরা যখনই দেখবেন যে খেলাধুলায় ভারত জিতছে, পদক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন তাঁরাও তাঁদের সন্তানদের খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করবেন। কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যখন তাঁরা দেখবেন যে সমস্ত সরকারি ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের ক্রীড়াবিদদের উৎসাহিত করতে কোনো ত্রুটি অবশিষ্ট রাখছে না, তখন তাঁরা বুঝতে পারবেন যে খেলাধুলা একটি কাঙ্ক্ষিত এবং মর্যাদাপূর্ণ পেশাও হতে পারে।

খেলাধুলায় ভারতের অসাধারণ সাফল্যকে বিভিন্নভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়। একটি উপায় হলো আমাদের রাজ্যগুলিকে 'এক রাজ্য-এক খেলা' পদ্ধতির জন্য উৎসাহিত করা। সমস্ত রাজ্য একটি বিশেষ খেলা বা কয়েকটি খেলাকে (অন্যান্য খেলা উপেক্ষা না করে) বিকাশের জন্য অগ্রাধিকার দিতে পারে, উপলব্ধ প্রতিভা, শিশুদের স্বাভাবিক আগ্রহ, জলবায়ু এবং নিজ নিজ এলাকায় উপলব্ধ পরিকাঠামোগত সুবিধার উপর ভিত্তি করে খেলা পছন্দ করা যেতে পারে। এটি একটি মনোযোগী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যে উপলব্ধ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে। এর বাইরে, 'এক খেলা-এক কর্পোরেট' পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য আমাদের অবশ্যই এই প্রচারাভিযানে 'কর্পোরেট ইন্ডিয়া'কেও যুক্ত করতে হবে। বিশ্বব্যাপী উদীয়মান প্রতিভাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, লিগ তৈরি করা, অভিজ্ঞতা প্রদান এবং খেলোয়াড়দের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে কোম্পানিগুলি বিপণনের পাশাপাশি প্রচারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বছরের পর বছর ধরে ক্রিকেটের সঙ্গে কর্পোরেট সংস্থাগুলির সাফল্যের গল্পগুলি অনুকরণীয়। এছাড়াও নতুন ফিনটেক ইউনিকর্ন এখন খেলাধুলায় পৃষ্ঠপোষকতা করতে এফএমসিজি গ্রহণ করছে। এতে খেলোয়াড়, সংস্থাগুলি এবং খেলা-প্রত্যেকের উপকার হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া সংস্কৃতি তৈরি করা। এর জন্য, স্থানীয় রাজ্য এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন খেলাধুলার ক্যালেন্ডার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা অপরিহার্য। ভারতের প্রতিটি খেলায় অবিলম্বে 'আঞ্চলিক লিগ' গঠনের প্রয়োজন যা বিভিন্ন পর্যায়ে তরুণ ক্রীড়াবিদদের সারা বছর ধরে তাঁদের দক্ষতা বিকাশের সুযোগ দেবে, দেশের মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি করবে। আমি এটাও বিশ্বাস করি যে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা অলিম্পিক গেমসে ভালো ফলের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী উৎসে পরিণত হতে পারে। এই ব্যবস্থাগুলি আগ্রহ এবং অংশগ্রহণের মধ্যে ব্যবধানকে দূর করবে।

আরেকটি বিষয় যা ভারতীয় ক্রীড়াজগতকে সাহায্য করেছে তা হলো গুণমান এবং বৈশ্বিক মানগুলির উপর জোর দেওয়া। আগেকার দিনে বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি আমলাতান্ত্রিক ছিল, ফলে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো। মোদী সরকারের অধীনে এই পদ্ধতির বদল হয়েছে। এখন প্রধানমন্ত্রী খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য গ্রহণেও স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। টোকিয়ো অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী দলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সময়, তিনি খেলোয়াড়দের ক্রীড়া পরিকাঠামো কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, সে বিষয়ে তাঁদের মতামত জানতে চান। মীরাবাই হোক বা মেরি কম, তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত করেছেন যে খেলোয়াড়রা আঘাত পেলে, তাঁরা যেন সবসময় সর্বোত্তম চিকিৎসা পান।

ভারতীয় খেলাধুলাকে নেতিবাচক দিক থেকে প্রভাবিত করছে এমন অনেক সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো আধুনিক প্রযুক্তির উত্থান। প্রধানমন্ত্রী তাঁর 'পরীক্ষা যোদ্ধা' বইয়ে এবং 'পরীক্ষা পে চর্চা' অনুষ্ঠানেও এই সমস্যাটির কথা তুলে ধরেছেন। তিনি খেলার মাঠ এবং প্লে স্টেশনকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তিনি আধুনিক প্রযুক্তির অগ্রগতিকে অস্বীকার করেননি, বরং একটি সুস্থ ভারসাম্যযুক্ত পরিবেশ গঠনের আহ্বান জানান, যেখানে খেলাধুলার মানবিক উপাদান-দলবদ্ধতা এবং সংহতি প্রচার করা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতিতেও এই ধরনের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা ক্রীড়াশিক্ষাকে একটি আকর্ষণীয় বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করে তুলবে। আগামী বছরে, মণিপুরে দেশের প্রথম ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হবে, যা ক্রীড়াবিদদের জন্য বিশেষ করে উত্তর-পূর্বের খেলোয়াড়দের কাছে আশীর্বাদ হয়ে উঠবে।

টোকিয়ো অলিম্পিক ভারতের খেলাধুলার ইতিহাসে মাইলফলক স্থাপন করেছে। আমরা অ্যাথলেটিক্সে প্রথম স্বর্ণপদক জিতেছি, হকি দল অসাধারণ খেলেছে এবং সাফল্যও পেয়েছে, ডিস্কাস থ্রো, গল্ফ, ফেন্সিং-এর মতো অন্যান্য খেলাতেও আমরা ভালো ফল করেছি। 'টার্গেট অলিম্পিক পডিয়াম স্কিম', 'খেলো ইন্ডিয়া' এবং ফিট ইন্ডিয়া ক্যাম্পেন বৃহত্তর সাফল্যের ভিত্তি স্থাপন করেছে। নতুন ভারতে খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলায় জয়লাভের তাগিদ লক্ষ্য করা গিয়েছে। আমাদের দেশের ক্রীড়াবিদদের খেলাধুলায় দক্ষতা অর্জনের প্রচেষ্টায় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

(লেখক কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী)

দ্রোণাচার্য পুরস্কারে ভূষিত হলেন বাঙ্গলার গর্ব তপন কুমার পাণিগ্রাহী

মহিষাদলবাসীর কাছে খবরটি পৌঁছলো যে তাদের ঘরের সন্তান তপন কুমার পাণিগ্রাহী পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র 'দ্রোণাচার্য লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার পাচ্ছে। আনন্দে মুখর মহিষাদলবাসীর কাছে ভূমিপুত্রের এই পুরস্কারপ্রাপ্তি কার্যতই দীপাবলীর উপহার।

পাড়ার এঁদো পুকুরে সাঁতার কাটতে কাটতে ছোটো বড়ো নদী-সমুদ্র পেরিয়ে নিজের তৈরি সাঁতার অ্যাকাডেমি। প্রায় স্বপ্নের মতো একটি যাত্রাপথ পেরিয়ে তপন আজ দ্রোণাচার্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাঁতার ও ক্রীড়াবিজ্ঞানে জীবনভর অবদানের জন্য এবছর দ্রোণাচার্য পুরস্কার তুলে দেওয়া হলো তাঁকে। লাইফটাইম ক্যাটাগরিতে সাঁতারে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম কোনো কোচ এই পুরস্কার পেলেন।

স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার (সাই)

প্রাক্তন সিনিয়র সাঁতার কোচ তপনবাবু বর্তমানে মহারাষ্ট্রের পুনেতে থাকেন। সেখানেই রয়েছে তাঁর নিজস্ব সুইমিং অ্যাকাডেমি। শুধু আন্তর্জাতিক মানের কোচ হিসেবেই নয়, সারা বিশ্বে একজন ক্রীড়াবিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর খ্যাতি রয়েছে। গত তিন দশক ধরে তিনি ফিজিওলজি ও স্পোর্টস সায়েন্সে গবেষণা করেছেন। তাঁর গবেষণা সাঁতারু ছাড়াও অন্যান্য ক্রীড়াবিদদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য পেতে সহায়তা করে। তিনি জার্মানি ও হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়া সংক্রান্ত গবেষণায় গোল্ড মেডেল পেয়েছেন ১৯৯১-এ। এরপরই স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া তাঁকে কোচ হিসেবে আমন্ত্রণ জানায়। দেশকে দু'শোর বেশি সাঁতারু উপহার দিয়েছেন তিনি। ওড়িশা সরকার তাঁকে সেই রাজ্যের স্পোর্টস এক্সলেন্স সেন্টারের সর্বোচ্চ পদে নিয়োগের আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

মন্ত্রক থেকে ইমেলে খবরটি পাওয়ার পর একটি সাক্ষাৎকারে তপনবাবু বলেন, 'এই পুরস্কার আমাকে চৌষট্টি বছর বয়সেও আরও বেশি কাজ করতে অনুপ্রাণিত করল। কাজের স্বীকৃতি পেয়ে বারবার আবেগপ্রবণ হয়ে যাচ্ছি। দেশ বিদেশ থেকে বহু ছাত্র, শিক্ষক ও শুভানুধ্যায়ীর শুভেচ্ছায় মেসেজবক্স উপচে পড়েছে। এবার পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া উন্নয়নে কিছু করতে চাই। সাইয়ে কোচিঙের কাজের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে এতদিন ঘুরেছি। নিজের জন্মভূমি মহিষাদলে ফিরে সাঁতার-সহ অন্যান্য ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নতিতে কাজ করতে চাই।'

মধ্যবঙ্গে স্বস্তিকা প্রচার প্রতিনিধি সম্মেলন

রাষ্ট্র বিচার ধারার সাপ্তাহিক বাংলা সংবাদ পত্রিকা স্বস্তিকার মধ্যবঙ্গের প্রচার প্রতিনিধিদের ২১ নভেম্বর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, আসানসোল, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান জেলার প্রচার প্রতিনিধিরা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন উত্তর বীরভূম জেলার সঙ্ঘচালক গৌতম নিয়োগী। বৈঠকের মূল বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বস্তিকার প্রকাশক জয়ন্ত পাল। একা ২৫০ কপি স্বস্তিকা চালাচ্ছেন বাঁকুড়া জেলার অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক অবনীভূষণ মণ্ডল। স্বস্তিকা কেন পড়বো? এই বিষয় সবার সামনে রাখায় প্রচার প্রতিনিধিদের কাছে প্রেরণার পাথেয় স্বরূপ হয়েছে। স্বস্তিকার ৭৫ বছর এবং স্বস্তিকা গ্রাহক অভিযান, এছাড়া প্রস্তাবিত আকারে স্বস্তিকাকে সম্পূর্ণ রঙিন ও দাম বৃদ্ধি হলে কেমন হবে এইসব বিষয় স্বস্তিকার প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল সবার সামনে চর্চা করেন। স্বস্তিকার প্রচার ও প্রসার

এবং স্বস্তিকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে টিম তৈরি সমস্ত প্রচার প্রতিনিধিদের সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেন স্বস্তিকার পরিচালন সমিতির ডাইরেক্টর অরিন্দম সিংহরায়। সমবেত গীত গেয়ে মুগ্ধ করেন মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল।

সম্মেলনে পরিচয় পর্ব এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা করেন জয়রাম মণ্ডল।

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ১৫।।